হাতেকলমে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) : ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ এই লেখক অধ্যাপকের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। তিনি *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থের রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে — *দ্বীপময় ভারত* ও *শ্যামদেশ*, *ইউরোপ ভ্রমণ*, *সাংস্কৃতিকী* প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনী *জীবনকথা* একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

১.১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম কী?

১.২ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

২.১ লেখকের কোন ট্রেন ধরার কথা ছিল?

২.২ একটা তৃতীয় শ্রেণির বগির কাছে একেবারেই লোকের ভিড় নেই কেন?

২.৩ পাঠানদের মাতৃভাষা কী?

২.৪ বৃদ্ধ পাঠানের ডেরা বাংলাদেশের কোথায় ছিল?

২.৫ খুশ-হাল খাঁ খট্টক কে ছিলেন?

২.৬ আদম খাঁ ও দুরথানির কিসসার কাহিনি কেমন?

২.৭ এই পাঠ্যে কোন বাংলা মাসিকপত্রের উল্লেখ আছে?

২.৮ রোজার উপোসের আগে কাবুলিওয়ালারা ভরপেট কী খেয়েছিলেন?

২.৯ 'তসবিহ' শব্দের অর্থ কী?

২.১০ আরবি ভাষায় ঈশ্বরের নিরানব্বইটি পবিত্র ও সুন্দর নামকে কী বলা হয়?

৩. **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

হুংকার, স্বস্তি, বিষয়ান্তর।

৪. **নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করো:**

ফিরতি, আভিজাত্য, জবরদস্ত, নিবিষ্ট, উৎসাহিত।

৫. **ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো :**

শীতবস্ত্র, মাতৃভাষা, শিশুসুলভ, ত্রিসীমানা।

৬. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো:**

৬.১ গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভিড় দেখা গেল। (না-সূচক বাক্যে)

৬.২ কাবুলিওয়ালা পাঠানদের মাতৃভাষা পশতুর সম্মান তখন ছিল না। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৬.৩ কলকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। (জটিল বাক্যে)

৬.৪ দুই-একজন মাঝে-মাঝে এক-আধ লবজ ফারসি বললে বটে, কিন্তু এদের বিদ্যেও বেশিদূর এগোল না। (সরল বাক্যে)

৬.৫ বাংলাদেশে তোমার ডেরা কোথায়? (নির্দেশক বাক্যে)

৭. **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে টীকা লেখো:**

কাবুলিওয়ালা, পশতু, ফারসি, আফগানিস্থান, বরিশাল, গজল, উর্দু, নমাজ।

শব্দার্থ : আলেম — সর্বজ্ঞ। সুখসৌপ্তিক — আরামের ঘুম সম্বন্ধীয়।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৮.১ স্টেশনে পৌঁছে লেখক কী দেখেছিলেন?

৮.২ দু-চারটি ফারসি কথা বলতে পারার ক্ষমতা লেখককে কী রকম সাহস দিয়েছিল?

৮.৩ 'আলেম' শব্দের মানে কী? লেখককে কারা, কেন 'এক মস্ত আলেম' ভেবেছিলেন?

৮.৪ আগা-সাহেব সম্বন্ধে যা জানা গেল, সংক্ষেপে লেখো।

৮.৫ লেখকের সামনের বেঞ্চির দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখো। লেখক কীভাবে সেই কথার অর্থ বুঝতে পারলেন?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ পাঠ্য গদ্যটির ভাবের সঙ্গে 'পথচল্‌তি' - নামটি কতখানি সংগতিপূর্ণ হয়েছে, বিচার করো।

৯.২ পাঠ্য গদ্যাংশটি থেকে কথকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি তোমার চোখে ধরা পড়েছে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে লেখো।

৯.৩ কথকের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের প্রারম্ভিক কথোপকথনটি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৯.৪ কথক কেন বলেছেন — 'যেন এক পশতু-সাহিত্য-গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে দিলুম।'— সেই সাহিত্য সম্মেলনের বর্ণনা দাও।

৯.৫ 'পথচল্‌তি' রচনায় ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যে সহজ বন্ধুত্ব ও উদার সমানুভূতির ছবিটি পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। বর্তমান সময়ে এই বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিয়ে দাও।

১০. রেলভ্রমণের সময় অচেনা মানুষের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি রম্যরচনা লেখো। তোমার লেখাটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি আঁকো।

একটি চড়ুই পাখি

তারাপদ রায়

চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই
বাসা বাঁধে। অন্ধকার ঠোঁটে নিয়ে সন্ধ্যা ফেরে যেই
সে'ও ফেরে; এ বাড়ির খড় কুটো, ও বাড়ির ধান
ছড়ায় শব্দের টুকরো, ঘর জুড়ে কিচিমিচি গান।
কখনো সে কাছাকাছি কৌতূহলী দুই চোখ মেলে
অবাক দৃষ্টিতে দেখে—হয়তো ভাবে লোকটা চলে গেলে
এই ঘর জানলা দোর, টেবিলে ফুলদানি, বই-খাতা
এ সব আমার-ই হবে; আমাকেই দেবেন বিধাতা।

আবার কার্নিশে বসে চাহনিতে তাচ্ছিল্য মজার,
ভাবটা যেন—এই বাজে ঘরে আছি নিতান্ত মায়ার
শরীর আমার তাই। ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি
এপাড়ায়-ওপাড়ায় পালেদের বোসেদের বাড়ি।
তবুও যায় না চলে এতটুকু দয়া করে পাখি
রাত্রির নির্জন ঘরে আমি আর চড়ুই একাকী।

হাতে কলমে

তারাপদ রায় (১৯৩৬ - ২০০৭) : বিশিষ্ট কবি ও রসরচনাকার। কথ্যভঙ্গি ও পরিহাস মিশ্রিত কাব্যভাষায় তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *তোমার প্রতিমা, নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু, দারিদ্র্যরেখা, জলের মতো কবিতা*। বাংলা শিশুসাহিত্যের পরিচিত চরিত্র *ডোডো* ও *তাতাই* তাঁরই সৃষ্টি।

১.১ তারাপদ রায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ কবিতায় চড়ুই পাখিটিকে কোথায় বাসা বাঁধতে দেখা যায়?

২.২ চড়ুই পাখি এখান-সেখান থেকে কী সংগ্রহ করে আনে?

২.৩ কবির ঘরে কোন কোন জিনিস চড়ুই পাখিটির চোখে পড়ে?

২.৪ ইচ্ছে হলেই চড়ুই-পাখি কোথায় চলে যেতে পারে?

৩ নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৩.১ 'চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই বাসা বাঁধে।' — চড়ুই পাখিকে এখানে 'চতুর' বলা হলো কেন?

৩.২ কবিতায় বিধৃত চিত্রকল্পগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩.৩ 'হয়তো ভাবে ...' —চড়ুই পাখি কী ভাবে বলে কবি মনে করেন?

৩.৪ 'আবার কার্নিশে বসে চাহনিতে তাচ্ছিল্য মজার, ...' — তাচ্ছিল্যভরা মজার চাহনিতে তাকিয়ে চড়ুই কী ভাবে?

৩.৫ 'চড়ুই পাখিকে কেন্দ্র করে কবির ভাবনা কীভাবে আবর্তিত হয়েছে, তা কবিতা অনুসরণে আলোচনা করো।

৩.৬ 'তবুও যায় না চলে এতটুকু দয়া করে পাখি' — পঙ্‌ক্তিটিতে কবিমানসিকতার কীরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

৩.৭ ছোট্ট চড়ুই পাখির জীবনবৃত্ত কীভাবে কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরে আঁকা হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৩.৮ 'কৌতূহলী দুই চোখ মেলে অবাক দৃষ্টিতে দেখে' — চড়ুইপাখির চোখ 'কৌতূহলী' কেন? তার চোখে কবির সংসারের কোন চালচিত্র ধরা পড়ে?

৩.৯ 'রাত্রির নির্জন ঘরে আমি আর চড়ুই একাকী।' — পঙ্‌ক্তিটিতে 'একাকী' শব্দটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩.১০ 'একটি চড়ুই পাখি' ছাড়া কবিতাটির অন্য কোনো নামকরণ করো। কেন তুমি এমন নাম দিতে চাও, তা বুঝিয়ে লেখো।

শব্দার্থ: কার্ণিশ — ছাদ বা দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশ। চাহনি — নজর / দৃষ্টিপাত। তাচ্ছিল্য — অবজ্ঞা/অবহেলা।

৪ **নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করো :**

সন্ধ্যা, কৌতূহলী, দৃষ্টি

৫. **নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো :**

৫.১ চতুর চড়ুই এক ঘুরে ফিরে আমার ঘরেই বাসা বাঁধে।

৫.২ বই-খাতা এসব আমার-ই হবে।

৫.৩ আবার কার্নিশে বসে।

৫.৪ এই বাজে ঘরে আছি।

৫.৫ ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি।

৬. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৬.১ অন্ধকার ঠোঁটে নিয়ে সন্ধ্যা ফেরে যেই সে'ও ফেরে। (সরল বাক্যে)

৬.২ কখনো সে কাছাকাছি কৌতূহলী দুই চোখ মেলে অবাক দৃষ্টিতে দেখে। (নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের বিশেষ্যের রূপ লিখে বাক্যটি আবার লেখো।)

৬.৩ আমাকেই দেবেন বিধাতা। (না-সূচক বাক্যে)

৬.৪ এই বাজে ঘরে আছি নিতান্ত মায়ার শরীর আমার তাই। (জটিল বাক্যে)

৬.৫ ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারি এ পাড়ায় ও পাড়ায় পালেদের বোসেদের বাড়ি। (জটিল বাক্যে)

৭. **নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :**

চড়ুই, ধান, চোখ, জানলা, দোর, ইচ্ছে, পাখি

৮. 'চোখ' শব্দটিকে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

দাঁড়াও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

হাতেকলমে

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য*। এছাড়াও *ধর্মে আছি জিরাফেও আছি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, সোনার মাছি খুন করেছি, যেতে পারি কিন্তু কেন যাব* উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। *কুয়োতলা, অবনী বাড়ি আছো?* তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি উপন্যাস। তিনি *আনন্দ* পুরস্কার এবং *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছেন।

১.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ 'মতো' শব্দ ব্যবহার করা হয় কখন? তোমার যুক্তির পক্ষে দুটি উদাহারণ দাও।

২.২ কবি পাখির মতো পাশে দাঁড়াতে বলছেন কেন?

২.৩ 'মানুষই ফাঁদ পাতছে' — কবি এ কথা কেন বলেছেন? 'মানুষ' শব্দের সঙ্গে 'ই' ধ্বনি যোগ করেছেন কেন— তোমার কী মনে হয়?

২.৪ 'তোমার মতো মনে পড়ছে' — এই পঙ্‌ক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ কী?

২.৫ 'এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও' — এই পঙ্‌ক্তিটির বিশেষত্ব কোথায়? এই ধরনের দুটি বাক্য তুমি তৈরি করো।

৩. 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' — কী কারণে কবি এই কথা বলেছেন?

৪. 'মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও'— এই পঙ্‌ক্তিটিকে তিনবার ব্যবহার করার কারণ কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

৫. কবিতাটির নাম 'দাঁড়াও' কতটা সার্থক? কবিতাটির নাম 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' হতে পারে কি— তোমার উত্তরের ক্ষেত্রে যুক্তি দাও।

৬. কবি কাকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনুরোধ করছেন বলে তোমার মনে হয়?

৭. কবিতাটি চলিত বাংলায় লেখা, শুধু একটা শব্দ সাধু ভাষার। শব্দটি খুঁজে বার করো এবং শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন কেন কবি?

৮. প্রথম স্তবকের তিনটি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটির দলসংখ্যা কত? প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কটি বুদ্ধদল ও মুক্তদল নিয়ে তৈরি?

৯. **কী ঘটেছে লেখো :**

সন্ধ্যা > সন্ধে

ফাদ > ফাঁদ

পল্লীসমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্ণবেলায় একটু ধরন করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডীপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটোবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কী?

চাষিরা কহিল, একশো বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশো বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষিদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারি প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তর ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মতো আছে। বৎসরে দুশো টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষিরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে তো আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়া দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন বাঁধটা?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরিব, তারা দিতে তো পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেবো সে তো বুঝতে পারিনে!

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে তো আমি বুঝতে পারিনে!

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরাজুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করোগে; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিল,

ভেবে দেখুন বড়দা আমাদের তিন ঘরের দুশো টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরিবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিল, হলো হলোই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও তো দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশো টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কী?

যেন ভারি হাসির কথা! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া থুথু ফেলিয়া শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কী? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠান্ডা করে চলো, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কী? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটোলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল- আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম তার মত হলে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিল বেশ, গিয়ে দেখো গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বলো খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহায় প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথায় আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য

রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদাবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু-জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি। তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কী বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোনো বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছরে সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তাহলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল না, অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা এ কটা টাকা? তোমার অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালো। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্ছি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিয়ো না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভালো, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রুপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি! চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে কিন্তু তুমি তা নও! তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল, তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেননি; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর

মুখে যা বেধেচে, স্ত্রী লোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কী করব, তাও এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেবো - তোমরা পারো আটকাবার চেষ্টা করো গে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন?

রমা কহিল, কারণ এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখে যে কীরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভারের মূল্যেও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জলকাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস রমা?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি। দাসি কহিল পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটোবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েছেন যে সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরিব-দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে —পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি তো ঘোষাল-বংশের ছেলে আমি নই। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা তুমি একবার বলো না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মতো নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস! হাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটোবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই তো বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানি চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানিটার সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়োবাবু? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ্ করে বসে পড়ল বড়োবাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্যে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভালো করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানিটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কী করে। সে নিজেই যে এতবড়ো লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটোবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাক্‌রান, তিন বাপব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মতো তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও তো জমিজমা আছে, সমঝে দেখ রে সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটোবাবু তুমি একটিবার পথ ছাড়া তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা —তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়োবাবু বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি — ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়োবাবু, চোখে দেখলি জানতি পারতে ছোটোবাবু কী!

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটোবাবু কী ! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটোবাবু চরাও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা দিনকে রাত করতি বলো বড়োবাবু?

বেণী কহিল নাহয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেন্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভালো করে আর একবার বুঝিয়ে বলো না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কী কও বড়োবাবু সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না? দিদিঠাকরান তুমি হুকুম করলে আসামি হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হবো কোন কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান আর সব পারি সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড়ো অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল; ইহার কোনো হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কী করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

হাতেকলমে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) : রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বর্ণময় জীবনের অধিকারী। তাঁর লেখায় জীবনের সেই অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *বড়দিদি, পল্লীসমাজ, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন* প্রভৃতি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে *লালু, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ* ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *পল্লীসমাজ* উপন্যাসের অংশ বিশেষ।

১.১ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

১.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দুটি ছোটো গল্পের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১ গোপাল সরকারের কাছে বসে রমেশ কী করছিল?

২.২ গ্রামের একমাত্র ভরসা কী ছিল?

২.৩ ‘বোধ করি এই কথাই হইতেছিল’— কোন কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

২.৪ রমা আকবরকে কোথায় পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়েছিল?

২.৫ ‘পারবি নে কেন?’ — উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন কাজটি করতে পারবে না?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৩.১ কুড়িজন কৃষক রমেশের কাছে এসে কেঁদে পড়ল কেন?

৩.২ রমেশ বেণীর কাছে জল বার করে দেবার হুকুম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল কেন?

৩.৩ বেণী জল বার করতে চায়নি কেন?

৩.৪ ‘ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল’ — রমেশের এমন অবস্থা হয়েছিল কেন?

৩.৫ ‘রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল’ — রমেশের বিস্ময়ের কারণ কী ছিল?

৩.৬ রমা রমেশের অনুরোধে রাজি হয়নি কেন?

৩.৭ ‘মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে’ — কে, কার সম্পর্কে একথা বলেছিল? সে কেন একথা বলেছিল?

৩.৮ ‘রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল’ — রমার এমন অবস্থা হয়েছিল কেন?

৩.৯ রমা আকবরকে ডেকে এনেছিল কেন?

৩.১০ ‘মোরা নালিশ করতি পারব না’ — কে একথা বলেছে? সে নালিশ করতে পারবে না কেন?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৪.১ ‘ নইলে আর ব্যাটাদের ছোটোলোক বলেচে কেন’? — বক্তা কে? এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাও?

৪.২ বেণী, রমা ও রমেশ — চরিত্র তিনটির তুলনামূলক আলোচনা করো। সেইসঙ্গে এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে কোন চরিত্রটি তোমার সবথেকে ভালো লেগেছে এবং কেন তা জানাও।

৪.৩ উপন্যাসের নামে পাঠ্যাংশটির নামকরণও ‘পল্লীসমাজ’ রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নামকরণটি সুপ্রযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে মতামত জানাও।

৪.৪ পল্লীসমাজ পাঠ্যাংশে সমান্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো নিদর্শন পেয়ে থাকলে সে সম্পর্কে আলোচনা করো। এ ধরনের ব্যবস্থার সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করো।

শব্দার্থ: সংবরণ — নিয়ন্ত্রণ। কোপালে — কোদাল দিয়ে মাটি কাটা। খুড়ো — কাকা। তদাবস্থায় — সেই অবস্থায়। বিহ্বল — হতভম্ভ। অগোচর — ইন্দ্রিয়ের অতীত। বাগবিতন্ডা — তর্কাতর্কি। আল্লার কিরে — আল্লার নামে দিব্য বা শপথ গ্রহণ।

৫. সন্ধি করো :

বৃষ্ + তি = সম্ + ববণ = কাঁদ্ + না =

অতি + অন্ত = অন্ + আত্মীয় = এক + অন্ত =

৬. **নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

নিরুত্তর, নমস্কার, তারকেশ্বর, যথার্থ, প্রত্যাখ্যান, আশ্চর্য, তদবস্থা

৭. **নীচে দেওয়া শব্দগুলির দলবিশ্লেষণ করো :**

অপরাহ্ণ, অকস্মাৎ, আহ্বান, দক্ষিণ, উচ্ছিষ্ট, উত্তপ্ত, বিস্ফারিত, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুপ্লাবিত, হিন্দুস্থানি, অস্বচ্ছ

৮. **নীচে দেওয়া ব্যাসবাক্যগুলিকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করো কোনটি কী ধরনের সমাস তা নির্ণয় করো :**

৮.১ জল ও কাদা =

৮.২ নয় আহত =

৮.৩ ত্রি অধিক দশ =

৮.৪ বেগের সহিত বর্তমান =

৮.৫ মড়ার জন্য কান্না =

৮.৬ চণ্ডী পুজোর জন্য তৈরি যে মণ্ডপ =

৯. **নীচে বাক্যগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করো :**

৯.১ কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। (যৌগিক বাক্যে)

৯.২ এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। (সরল বাক্যে)

৯.৩ ওরা যাবে কি? (নির্দেশক বাক্যে)

৯.৪ বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। (হ্যাঁ বাচক বাক্যে)

৯.৫ তুমি নীচ, অতি ছোটো। (যৌগিক বাক্যে)

৯.৬ পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৯.৭ মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। (জটিল বাক্যে)

১০. **নীচে দেওয়া শব্দদুটিকে দুটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো :**

যাত্রা, বাঁধ

ছন্নছাড়া

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া—
আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।
ওই পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে—
চোঙা প্যান্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা?
চেনেন না ওদের?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের —এক নেই রাজ্যের বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই?
ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দে—

ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই

মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই—
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়—
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ—
শুধু নিজের দিকে ঝোল-টানা।
এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক
তাও দিয়েছে লোপাট করে।
তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচহীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকাট
ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাক্সি, লে হালুয়া

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ওরা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে ছোকরা উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে,
বললুম, কদ্দুর যাবে।
এই কাছেই। ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না, জলসা না, নয় কোনো ফিল্মি তারকার অভ্যর্থনা।
একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও—
আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি।
কে সে লোক?
একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি।
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো মাথার উপরে ছাদ নেই,
ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো।
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল।

চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে — আনন্দে ঝংকৃত হয়ে —
প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।
তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেন্টে-কংক্রিটে।
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—
প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান আছে
সমস্ত বাধানিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল
ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ,
উড়ে এসেছে রং-বেরঙের পাখি
শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি,
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া
যেন কোনো শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।

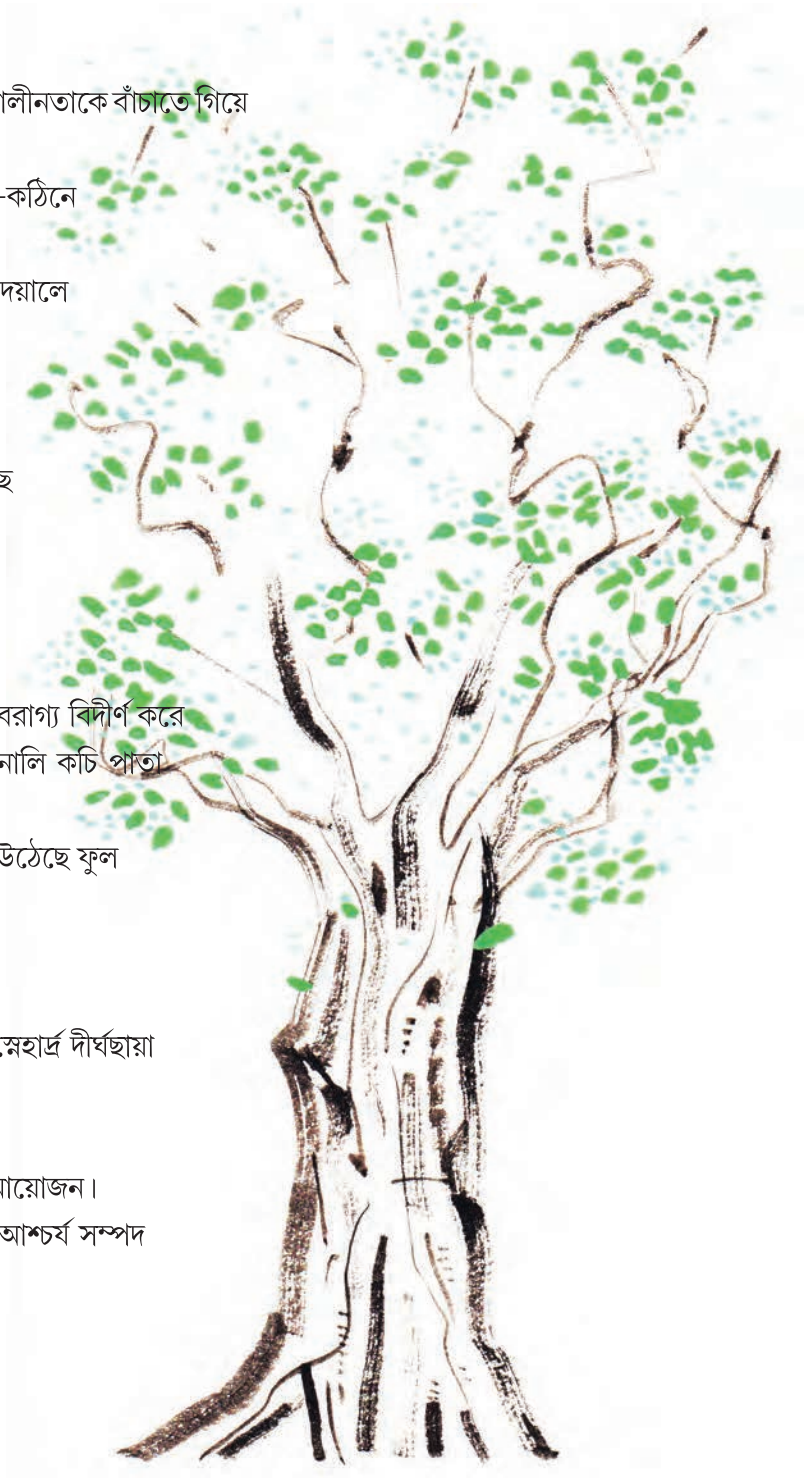

হাতেকলমে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—১৯৭৬): জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত নোয়াখালিতে। বিচিত্র কর্ম-অভিজ্ঞতার সাক্ষী এই লেখকের উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়, প্রাচীর ও প্রান্তর, অকালবসন্ত, অধিবাস, যতনাবিবি, সারেঙ* প্রভৃতি। *অমাবস্যা, আমরা, প্রিয়া ও পৃথিবী, নীল আকাশ, আজন্মসুরভি* তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। *কল্লোল* পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই লেখক -কবি *কল্লোলযুগ, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ* প্রভৃতি স্মরণীয় প্রবন্ধ গ্রন্থেরও প্রণেতা।

১.১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :

২.১ কবি প্রথমে গাছটিকে কেমন অবস্থায় দেখেছিলেন?

২.২ ‘ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।’ — ওদিকে না যেতে চাওয়ার কারণ কী?

২.৩ ‘তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।’ —সড়কের মাঝখানে, পথে এসে দাঁড়ানোর কারণ কী?

২.৪ ‘আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব।’ —কবির ‘ওখান’ দিয়েই যেতে চাওয়ার কারণ কী?

২.৫ ‘ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?’ — ওখানে কীসের ভিড়?

২.৬ ‘কে সে লোক?’-‘লোক’ টির পরিচয় দাও।

২.৭ ‘চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে .....’ —কী বলে তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল?

২.৮ ‘আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি’ — কবি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন কেন?

২.৯ ‘ফিরে আসতেই দেখি .....’ — ফেরার পথে কবি কী দেখতে পেলেন?

২.১০ ‘অবিশ্বাস্য চোখে দেখলুম’—কবির চোখে অবিশ্বাসের ঘোর কেন?

৩. নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৩.১ ‘ওই পথ দিয়ে

জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।’

— কবির যাত্রাপথের অভিজ্ঞতার বিবরণ দাও।

৩.২ ‘গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে

গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া — ’

— একটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে বলেও কেন পরের পঙ্‌ক্তিতে তাকে ‘গাছের প্রেতচ্ছায়া’ বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.৩ ‘ওই পথ দিয়ে

জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।’

— এভাবে কবিতায় উত্তমপুরুষের রীতি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্তত পাঁচটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দাও।

৩.৪ ‘কারা ওরা?’

— কবিতা অনুসরণে ওদের পরিচয় দাও?

৩.৫ ‘ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।’

— এই সাবধানবাণী কে উচ্চারণ করেছেন? ‘ওদের’ বলতে কাদের কথা বোঝানো হয়েছে? ওদের কাছে না ঘেঁষার পরামর্শ দেওয়া হলো কেন?

৩.৬ ‘তাই এখন এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।’

— এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের জীবনের এমন পরিণতির কারণ কবিতায় কীভাবে ধরা পড়েছে তা নির্দেশ করো।

৩.৭ ‘জিজ্ঞেস করলুম

তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে?’

— প্রশ্নবাক্যটিতে প্রশ্নকর্তার কোন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে? তাঁর এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ার পর কীরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলো?

৩.৮ ‘প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।’

— এই দুর্মর আশাবাদের ‘তপ্ত শঙ্খধ্বনি’ কবিতায় কীভাবে বিঘোষিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

৩.৯ কবিতায় নিজের ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে চাওয়া মানুষটির ‘ছন্নছাড়া’-দের প্রতি যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.১০ কবিতায় ‘গাছটি’ কীভাবে প্রাণের প্রতীক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৩.১১ ‘এক ক্ষয়হীন আশা

এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।’

— ‘প্রাণকে’ কবির এমন অভিধায় অভিহিত করার সঙ্গত কারণ নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো।

শব্দার্থ: প্রেতচ্ছায়া — প্রেত বা পিশাচের ছায়া । বাকল — গাছের ছাল। ছন্নছাড়া — বাউন্ডুলে। ক্ষুধাহরণ — খাবার ইচ্ছা চলে যাওয়া। সুধাক্ষরণ — অমৃত নিঃসরণ। ভব্যতা — ভদ্রতা। শালীনতা — লজ্জাশীলতা। স্নেহার্দ্র — স্নেহ দ্বারা আর্দ্র। প্রচ্ছন্ন — আবৃত, আচ্ছন্ন। মাধুর্য — মাধুরী, সৌন্দর্য।

৪. **নীচের প্রতিটি শব্দের দল বিভাজন করে দেখাও:**

এলোমেলো, ছন্নছাড়া, নৈরাজ্যে, বাসিন্দে, শালীনতা, আত্মীয়তা, শঙ্খধ্বনি, পত্রপুঞ্জে

৫. **নীচের প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো:**

বর্তমান, ভদ্রতা, সম্ভাষণ, গতি, ভিখিরি, ভব্যতা, রুষ্ট, জিজ্ঞেস, পিছে

৬. **নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কাজ করেছে তা দেখাও:**

জুতো, বাসিন্দে, ক্ষেত, চোখ, কদ্দুর, ভিখিরি।

৭. **নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো:**

প্রেতচ্ছায়া, ছাল-বাকল, ক্ষুধাহরণ, সোল্লাসে, স্নেহার্দ্র, শঙ্খধ্বনি

৮. **কোন শব্দে কী উপসর্গ আছে আলাদা করে দেখাও:**

প্রতিশ্রুতি, বেওয়ারিশ, অনুসরণ, প্রচ্ছন্ন, অভ্যর্থনা, অধিকার

৯. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৯.১ ওই পথ দিয়ে জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে। (জটিল বাক্যে)

৯.২ দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে— (যৌগিক বাক্যে)

৯.৩ কারা ওরা? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৯.৪ ঘেঁষবেন না ওদের কাছে। (ইতিবাচক বাক্যে)

৯.৫ একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ। (না-সূচক বাক্যে)

৯.৬ জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? (পরোক্ষ উক্তিতে)

৯.৭ আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি। (জটিল বাক্যে)

৯.৮ দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল (ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো)

গান

গাঁয়ের বধূ

সলিল চৌধুরী

কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো
রূপকথা নয় সে নয়
জীবনের মধুমাসের কুসুম-ছিঁড়ে-গাঁথা মালা
শিশির-ভেজা কাহিনি শোনাই শোনো।
একটুখানি শ্যামল-ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শিষের ইশারাতে
দিবাশেষে কিষাণ যখন আসত ফিরে
ঘি মউ মউ আম-কাঁঠালের পিঁড়িটিতে বসত তখন,
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়াভরে
শ্রান্তজনে হাতছানিতে ডাকত কাছে আদর করে সোহাগ ভরে

নীল শালুকে দোলন দিয়ে রং ফানুসে ভেসে
ঘুমপরি সে ঘুম পাড়াত এসে কখন জাদু করে
ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে।
আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে
সবার নিমন্ত্রণ।
সেখানে বারো মাসে তেরো পাবন আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে
গাঁয়ের বধূর শাঁখের ডাকে লক্ষ্মী এসে ভরে দিত
গোলা সবার ঘরে ঘরে।
হায়রে কখন এল শমন অনাহারের বেশেতে
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী
এল পিশাচেরা এল রে।
শত পাকে বাঁধিয়া নাচে তাথা তাথিয়া
নাচে তাথা তাথিয়া নাচে রে।
কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে
গেল প্রাণ শত প্রাণ গেল রে।
মায়ার কুটিরে নিল রস লুটি রে
মরুর রসনা এল রে।
হায় সেই মায়া-ঘেরা সন্ধ্যা
ডেকে যেত কত নিশিগন্ধা
হায় বধূ সুন্দরী কোথায় তোমার সেই
মধুর জীবন মধুছন্দা।
হায় সেই সোনাভরা প্রান্তর
সোনালি স্বপনভরা অন্তর
হায় সেই কিষাণের কিষাণীর জীবনের
ব্যথার পাষাণ আমি বহিরে।
আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো
ভাঙা কুটিরের সারি।
জেনো সেইখানে সে গাঁয়ের বধূর
আশা-স্বপনের সমাধি।।

সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৫) : বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার, কবি এবং নাট্যকার। চলচ্চিত্র-সংগীতের দুনিয়াতেও তিনি অসামান্য সাফল্য পেয়েছিলেন। কাজ করেছেন বাংলা, হিন্দি ও মালয়ালম ছবিতে। পেয়েছেন 'ফিল্মফেয়ার' পুরস্কার (১৯০৮) এবং 'সংগীত নাটক আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৮৮)। এই গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীটপতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্যে ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে করো, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। একসময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে

ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো, এই গাছ আর এই মরা ডালে কী প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একটিতে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে; অর্থাৎ তাহারা নড়েচড়ে। অবশ্য গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম নেয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোটো, কোনোটি বড়ো। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড়ো গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বনজঙ্গল দেখো, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলোর সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিনরাত্রি দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষশিশু অনেকদিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে করো, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড়ো ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোটো ছোটো ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে করো, একটি বীজ সমস্ত দিনরাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল! ক্রমে ধুলো ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষশিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাইরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষশিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

হাতে কলমে

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭) : বিজ্ঞানসাধক, পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এই লেখকের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ জগদীশচন্দ্র বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ১৩২৩-১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা রচনাগুলি *অব্যক্ত* গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র *পত্রাবলী* নামে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১.১ জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো?

১.২ জগদীশচন্দ্র বসু কী আবিষ্কার করেছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :

২.১ লেখক কবে থেকে গাছদের অনেক কথা বুঝতে পারেন?

২.২ ‘ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়।’ — কী দেখা যায়?

২.৩ জীবিতের লক্ষণ কী তা লেখক অনুসরণে উল্লেখ করো।

২.৪ ‘বৃক্ষ শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়।’ — বৃক্ষশিশু কোথায় নিদ্রা যায়?

২.৫ অঙ্কুর বের হবার জন্য কী কী প্রয়োজন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৩.১ ‘আগে এসব কিছুই জানিতাম না।’ — কোন বিষয়টি লেখকের কাছে অজানা ছিল?

৩.২ ‘ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়।’ — কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের মধ্যে কী লক্ষ করা যায়?

৩.৩ ‘গাছের জীবন মানুষের ছায়ামাত্র।’ — লেখকের এমন উক্তি অবতারণার কারণ বিশ্লেষণ করো।

৩.৪ জীবনের ধর্ম কীভাবে রচনাংশটিতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৩.৫ ‘নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়।’ — উপায়গুলি পাঠ্যাংশ অনুসরণে আলোচনা করো।

৩.৬ লেখক তাঁর ছেলেবেলার কথা পাঠ্যাংশে কীভাবে স্মরণ করেছেন, তা আলোচনা করো।

৩.৭ ‘ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে।’ — উদ্ধৃতিটির সাপেক্ষে নীচের ছকটি পূরণ করো।

বীজ	কোন ঋতুতে পাকে
১	
২	
৩	
৪	
৫	

৩.৮ ‘পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে লইলেন।’ — বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে লেখকের গভীর উপলব্ধি উদ্ধৃতিটিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

৩.৯ ‘প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না।’ — বীজ থেকে গাছের জন্মের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি আলোচনা করো।

৩.১০ ‘তখন সব খালি-খালি লাগিত।’ — কখনকার অনুভূতির কথা বলা হলো? কেন তখন সব খালি-খালি লাগত? ক্রমশ তা কীভাবে অন্য চেহারা পেল তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।

৪. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৪.১ আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। (সরল বাক্যে)

৪.২ তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৪.৩ ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। (জটিল বাক্যে)

৪.৪ তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। (না-সূচক বাক্যে)

৪.৫ প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৫. নীচের শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

কীটপতঙ্গ, স্বার্থত্যাগ, বৃক্ষশিশু, বনজঙ্গল, জনমানবশূন্য, দিনরাত্রি, দেশান্তরে, নিরাপদ।

৬. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৬.১ ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়।

৬.২ আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না।

৬.৩ বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না।

৬.৪ মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়।

৭. সন্ধিবদ্ধ পদগুলি খুঁজে নিয়ে সন্ধি-বিচ্ছেদ করো :

৭.১ তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়।

৭.২ অতি প্রকাণ্ড বটগাছ. সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে।

৭.৩ এই প্রকারে দিনরাত্রি দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

হাওয়ার গান

বুদ্ধদেব বসু

হাওয়াদের বাড়ি নেই, হাওয়াদের বাড়ি নেই,
নেই রে।
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে।
সারা-দিন-রাত্রির বুক-চাপা কান্নায়
নিশ্বাস ব'য়ে যায় উত্তাল, অস্থির—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে
বলে তারা, 'পৃথিবীর সব জল, সব তীর
ছুঁয়ে গেছি বার-বার দুর্বার ইচ্ছায়,
তবু নেই, সে তো নেই , নেই রে।
সব জল, সব তীর পাহাড়ের গম্ভীর
বন্দর, বন্দর, নগরের ঘন ভিড়,
অরণ্য, প্রান্তর শূন্য তেপান্তর—
সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে।

পার্কের বেঞ্চিতে ঝরা পাতা ঝর্ঝর,
শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর
চিমনির নিস্বনে, কাননের ক্রন্দনে
তার কথা কেবলই শুধাই রে।
তেমনি মিষ্টি ছেলে দোলনায় ঘুম যায়,
আবছায়া কার্পেট কুকুরের তন্দ্রায়,
ঘরে ঘরে জ্বলে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম—
সে-ই শুধু নিয়েছে বিদায় রে।
আঁধারে জাহাজ চলে, মাস্তুলে জ্বলে দীপ,
যাত্রীরা সিনেমায়, কেউ নাচে, গান গায়;
আমরা তরঙ্গের বুকে হানি প্রশ্নের
অবিরাম নর্তন, মত্ত আবর্তন—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে।

অবশেষে থামে সব, ডেক হয় নির্জন,
অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন,
সমুদ্র ওঠে দুলে, বাঁকা চাঁদ পড়ে ঝুলে—
আমাদের বিশ্রাম নেই, রে।
আমাদের বাড়ি নেই, দেশ নেই, শেষ নেই,
কেঁদে-কেঁদে মরি শুধু বাইরে,
বার-বার পারাপার যত করি, তবু তার
নেই, নেই, দেখা নেই, নেই রে।
সময় অন্তহীন, অফুরান সন্ধান,
বিশ্বের বুক ফেটে বয়ে যায় এই গান—
কোনখানে গেলে তারে পাই রে।
খুঁজে-খুঁজে ঘুরে ফিরি বাইরে,
সুরে-সুরে ব'লে যাই— নেই রে,
চিরকাল উত্তাল তাই রে।'

হাতেকলমে

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) : কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও সমালোচক। সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। বুদ্ধদেব রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দ্রৌপদীর শাড়ি, যে আঁধার আলোর অধিক, শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*। তিনি *কবিতা* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন *কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড, ঘুমপাড়ানি, এলোমেলো* প্রভৃতি রচনা। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

১.১ বুদ্ধদেব বসু রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি/দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ দুর্বার ইচ্ছায় হাওয়া কী কী ছুঁয়ে গেছে?

২.২ তার কথা হাওয়া কোথায় শুধায়?

২.৩ মাস্তুলে দীপ জ্বলে কেন?

২.৪ পার্কের বেঞ্চিতে আর শার্সিতে কাদের উপস্থিতির চিহ্ন রয়েছে?

২.৫ নিশ্বাস কেমন করে বয়ে গেছে?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ হাওয়ার চোখে ঘরের যে ছবি পাওয়া যায়, তা কবিতা অনুসরণে লেখো।

৩.২ সমুদ্রের জাহাজের চলার বর্ণনা দাও।

৩.৩ পৃথিবীর কোন কোন অংশে হাওয়া ঘুরে বেড়ায় লেখো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর বিশদে লেখো :

৪.১ হাওয়াদের কী নেই? হাওয়ারা কোথায় কীভাবে তার খোঁজ করে?

৪.২ 'চিরকাল উত্তাল তাই রে'— কে চিরকাল উত্তাল? কেন সে চিরকাল উত্তাল হয়ে রইল?

৪.৩ কবিতাটির নাম 'হাওয়ার গান' দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী যুক্তি কবির মনে এসেছিল বলে তোমার মনে হয়?

শব্দার্থ : পঞ্জর — পাঁজর। পারাপার — একূল ওকূল পার হওয়া। অফুরান — যা ফুরায় না।

৫. **নীচের পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে ক্রিয়া কে চিহ্নিত করো এবং অন্যান্য শব্দগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখাও।**

৫.১ ঘরে ঘরে জ্বলে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম

৫.২ আধাঁরে জাহাজ চলে

৫.৩ শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর

৫.৪ অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন

৬. ‘বন্দর, বন্দর নগরের ঘন ভিড়’ — পঙ্‌ক্তিটির প্রথমে একই শব্দ দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম আরো চারটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করো। কবিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের কৌশল অবলম্বনের কারণ কী?

৭. **ধ্বনি পরিবর্তনের দিক থেকে শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করো:**

☐ > চন্ন > ☐

☐ > রাত্তির

পঞ্জর > ☐

৯. ‘হাওয়ার গান’ কবিতায় ব্যবহৃত পাঁচটি ইংরেজি শব্দ লেখো। এই শব্দগুলির বদলে দেশি/বাংলা শব্দ ব্যবহার করে পঙ্‌ক্তিগুলি আবার লেখো।

কী করে বুঝব

আশাপূর্ণা দেবী

ছ-বছরের বুকু বাড়ির বাইরের রোয়াকে বসে খেলা করছিল। বাড়ির সামনে একখানা রিকশাগাড়ি এসে থামল। রিকশা থেকে নামলেন দুটি বেজায় মোটাসোটা ভদ্রমহিলা আর একটি বুকুর মতো বয়েসেরই ছেলে। সেটিও নেহাত রোগা নয়।

বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়, আরে বাবা! রিকশাগাড়ির অতটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা হয়েছিল কী করে?

দুটি মহিলার মধ্যে একটি মহিলা রোয়াকে উঠে একগাল হেসে বলেন, 'কী খোকা, চিনতে পারছ?'

বুকু দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দিকে সোজা তাকিয়ে যেন বেশ তলিয়ে একটু ভেবে নেয়,

তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দু-দিকে মাথা নাড়ে।

মহিলা দুটি তো ওর ধরন দেখে হেসেই খুন!

একজন বলেন, 'আহা আমরা এসেছিলাম সে-ই কবে ! ওর মনে থাকবে কী করে !'

বুকু বিজ্ঞের মতো বলে, 'তাছাড়া তখন হয়তো এত মোটা ছিলেন না আপনারা । এত মোটা কাউকে দেখিইনি কক্ষনো!'

শুনেই দুজনের মধ্যে একজনের মুখ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, আর একজন কিন্তু হেসে ওঠেন। খুকখুক করে হাসতে হাসতে বলেন, 'নির্মলার ছেলেটি তো আচ্ছা মজার কথা বলে! তা, তোমার মা বাড়ি আছেন তো খোকা?'

'হ্যাঁ।'

'চলো।' বলে এঁরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন।

শুধু ঢুকে পড়েন না, একেবারে বসেই পড়েন। ... বাইরের ঘরের হালকা-হালকা দু-খানা বেতের চেয়ারের মধ্যে নিজেদেরকে বেশ কায়দা করে ঠেসে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'কই খোকা, তোমার মা?'

'মা! মা তো সেই তিনতলার ছাতে, রান্নাঘরে।'

'ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠেন এঁরা— 'তিনতলায়! সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারব না বাবা, রক্ষে করো ! উঃ বাড়ি থেকে কি আজ বেরিয়েছি? বার দু-তিন বাসবদল, শেষ অবধি রিকশায়। ... যাও দিকিন বাবা ছুটে, তিনতলায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো তোমার মাকে। বলো গে ... উত্তরপাড়া থেকে ছেনুমাসিরা এসেছেন।'

বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়।

ইত্যবসরে নতুন -আসা ছেলেটি, যার নাম ডাম্বল, চেয়ারে গুছিয়ে বসার বদলে একখানা চেয়ার কনুইয়ের ধাক্কায় উলটেছে, টেবিল-ঢাকাটা কুঁচকে টেনে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছে, টেবিলের ওপরকার খাতাপত্তরগুলো এলোমেলো করেছে। এক্কেবারে ঘরের ওদিককার দেয়ালে রাখা আলমারিটার একটা পাল্লা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে, চাবিবন্ধ কলটা বন্ধ অবস্থাতেই পাল্লার সঙ্গে খুলে বেরিয়ে এসেছে ... সাজানো গোছানো বইয়ের সারি থেকে একসঙ্গে তিন-চারখানা বই নামিয়েই — 'দূর ছাই, ছবি নেই' -বলে বইগুলো মাটিতে ফেলে রেখে, অবশেষে জানালার ধাপের ওপর উঠে বসে পা দোলাতে শুরু করেছে।

বুকু এসে বলল, 'মা আসছেন। বললেন যে— ও কী! কী কাণ্ড করেছ তুমি? আলমারি ভেঙে বই নামিয়েছ?

ডাম্বল অগ্রাহ্যভরে বুকুর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'ইশ! আলমারি ভেঙে। একেবারে

গুঁড়িয়ে ছাতু করে ফেলেছি বলো। শুধু তো খুলেছি।'

বুকু জোরগলায় বলে 'তা খুলেছই বা কেন? ও-বই কার, তা জানো? সেজোকাকার! সেজোকাকার বই মাটিতে! ... ইঃ!'

বুকুর কথার ধরনেই বোঝা যায়, 'সেজোকাকা' লোকটি বিশেষ মোলায়েম নয়।

ডাম্বল কিন্তু বুকুর ভয়ের ধার ধারে না। ঠোঁট উলটে বলে, 'এঃ, ভারি তো বই ! হতচ্ছাড়া বই! ছবি নেই।'

বুকু গম্ভীরভাবে বলে, 'ছবি থাকবে কী জন্যে? ও কি ছোটোদের বই? ও তো বড়োদের বই। যেমন হাতির মতো চেহারা তোমার, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি। আচ্ছা আসুক না সেজোকাকা; মজা দেখিয়ে দেবেন একেবারে! পিঠের ছাল তুলবেন তোমার!'

মোটা মহিলা দুটি, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম— ছেনুমাসি আর অন্যটির নাম বেণুমাসি, তাঁরা চোখ ড্যাবড্যাব করে বুকুর কথা শুনছিলেন, এইবার রেগে গমগম করে ছেলেকে বললেন, 'ডাম্বল! বই তুলে রাখো! সব জায়গা নিজের বাড়ি নয়, বুঝলে?'

এইতেই ছেলেকে শাসন করা হয়ে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা মনে মনে বুকুর মুণ্ডুপাত করেন। ... কী অসভ্য ছেলে বাবা! কথা নয় তো, যেন ইটপাটকেল ! ছেলেকে কী শিক্ষাই দিয়েছে নির্মলা। এইবার ঘরে এসে ঢোকেন বুকুর মা নির্মলা, আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে। ঢোকা দেখেই বোঝা যায়, কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই হইহই করে অভ্যর্থনা শুরু করে দেন— 'ওমা, আমার কী ভাগ্যি! ছেনুমাসি বেণুমাসি যে! এতদিনে বুঝি মনে পড়ল? আমি তো

ভেবেছিলাম, ভুলেই গেছ আমাকে। সত্যি কতকাল পরে দেখা — কী আনন্দ যে হচ্ছে কী করে বলব! এত ভালো লাগছে ছেনুমাসি—'

বুকুর মা যতক্ষণ কথা কইছিলেন, বুকু অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই বলে ওঠে , 'ও কী মা? এই মাত্তর যে বললে— বাবারে, শুনে গা জ্বলে গেল! অসময়ে লোক বেড়াতে আসা। ভালো লাগে না— এখন আবার ভালো লাগছে বলছ কেন?'

ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত! এ কী সর্বনেশে ছেলে!

তিনি না হয় বলেই ফেলেছেন দুটো কথা তাই বলে এমনি করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে? ওদিকে ছেনু-বেণু দুই বোনের দুই দু-গুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে। তাঁরা বলে কত তোড়জোড় করে সেই উত্তরপাড়া থেকে ভবানীপুরে ছুটে এসেছেন পাতানো বোনঝিটির সঙ্গে দেখা করতে, আর তার কাছে কিনা এই অভ্যর্থনা! এদিকে বুকুর মা-র যে সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে, তা তো আর এঁরা জানেন না। সে কথা অবিশ্যি ফাঁস করেন না বুকুর মা, ছেলের কথার উপর ঝাপটা মেরে বলেন, 'কী শুনতে কী শুনিস হতভাগা ছেলে, যা হয় বললেই হলো?'

ছেনুমাসি চালতা চালতা গাল ফুলিয়ে তালের মতো করে গম্ভীরভাবে বলেন, 'আহা— তা ছেলেকে গাল দিচ্ছ কেন নির্মলা? সত্যিই তো অসময়ে এসে পড়ে কাজের ক্ষতি করে দিলাম।'

বুকুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কিচ্ছু না মাসিমা, এ সময়ে কোনো কাজ থাকে না আমার; এখন বিকেলবেলায় আবার এত কী কাজ?'

কিন্তু বুকু শেষ করতে দেয় না। টপ করে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাঃ কাজ নেই কী? এখনই তো গাদা গাদা

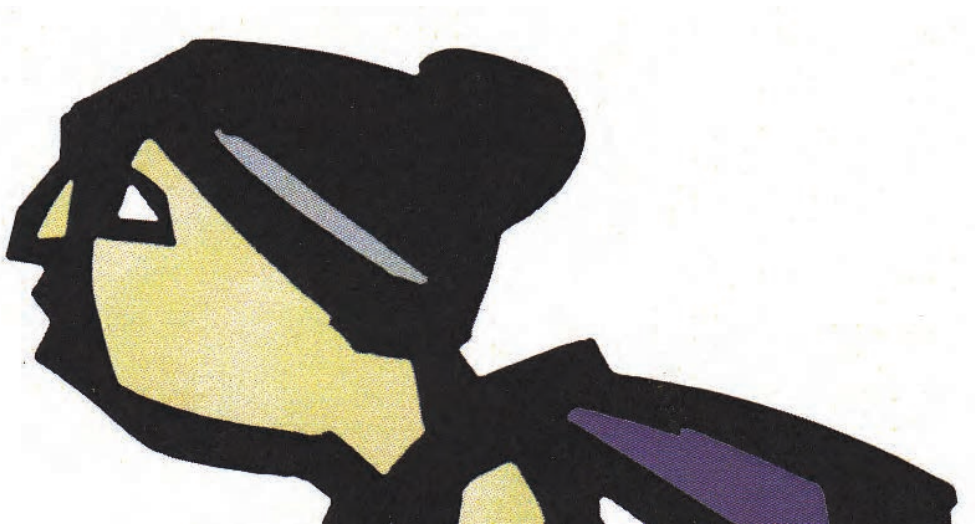

কাজ! সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে না আমাদের? বাবা এলেই তো চলে যাব, তাড়াতাড়ি রুটি-টুটি সব করে নেবে না?'

এত তাড়াতাড়ি কথা বলে বুকু , তাকে আর কথার মাঝখানে থামানো যায় না।

এরপর যদি বুকুর মা কালো ছেলের কান মলে লাল করে ছাড়েন, দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

কান মলে দিয়ে ধমক দেন , 'যা বেরো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ভূতে পেয়েছে নাকি আজকে? সত্যি এ ছেলেকে ধরে আছাড় মারলে রাগ যায়। তোমরাই বলো ছেনুমাসি? কেবল বানিয়ে কথা বলে।'

বুকু চলে যেতে বুকুর মা ডাম্বলকে নিয়ে পড়েন। 'ওমা ডাম্বল যে! দেখিনি এতক্ষণ! এত বড়ো হয়ে গেছে? আর কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! বেণুমাসি, তোমার এই ছেলেটিই বোধহয় সবচেয়ে ফরসা, তাই না!'

একেই তো পরের কালো ছেলেকে ফরসা বলা, বিচ্ছু ছেলেকে সোনা ছেলে বলা নিয়ম, তাছাড়া আবার নিজের ছেলের বেয়াড়া কথাগুলো ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য বেশি করেই বলতে হয় বুকুর মাকে। নইলে সত্যি কিছু আর ডাম্বল আহামরি ফরসা নয়।

বেণুমাসি এবারে একটু প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'না ডাম্বলও ছেলেবেলায় ওইরকম ছিল। এখন রোদে ঘুরে ঘুরে — তা, তোমার বুকুও তো কালো হয়ে গেছে।'

'আমার বুকু তো কালোই ছিল।. . . তারপর ডাম্বলবাবু, কী পড়তে-টড়তে শিখলে? ইস্কুলে ভরতি হয়েছ নাকি?'

বেণুমাসি কী বলতে যাচ্ছিলেন, ডাম্বল তড়বড় করে বলে ওঠে, 'কাঁচকলা! ইস্কুলে ভরতি করে দিলে তো। আমার বাবাটি যে হাড়কেপ্পন! বলেন , সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা! পারব না দিতে। পড়ে দরকার নেই, চাষবাস করে খাবে।'

এবারে বেণুমাসির মুখ চুন!

ছোটো ছেলেদের সামনে যথেচ্ছ কথা বলার ফল টের পান। ছোটো বোনকে সামলাতে ছেনুমাসি হি-হি করে হেসে বলে ওঠেন, 'তোর ছেলেটা কী পাকা পাকা কথা শিখেছে বেণু, শুনলেই হাসি পায়। বাব্বা! ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে।'

ইত্যবসরে বেণুমাসি ধাতস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, 'আজকালকার সব ছেলেই ওইরকম, দিদি। এই এক্ষুনি দেখলে না, নির্মলার ছেলে বুকু, ডাম্বল বই দু-খানায় একটু হাত দেবার জন্যে কীরকম শাসাল? বলে কিনা— যেমন হাতির মতো দেখতে, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি! সেজোকাকা তোমার পিঠের ছাল তুলবেন— এইসব।' টেনে টেনে হাসতে থাকেন বেণুমাসি।

শুনে তো বুকুর মা-র আক্কেল গুড়ুম! হঠাৎ আজ কী হলো ছেলেটার। সত্যিই ভূতে-টূতে পেল নাকি! কই এমন অদ্ভুত বেয়াড়া তো ছিল না। কী আর করেন। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, 'সত্যি! এই ছেলেকে নিয়ে যে আমাদের কী জ্বালাই হয়েছে ছেনুমাসি, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল । যত বড়ো হচ্ছে, তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে! কে জানে পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে নাকি!'

পাগলা বললে যদি দোষ খণ্ডায়! ছেনুমাসিরা অবিশ্যি তেমন বোকা নয় যে, সহজে ছেলেকে পাগল বললেই তাই বিশ্বাস করবেন। মনে মনে ভাবেন . . . মোটেই তা নয়, বরং পাগল বানাতে পারে লোককে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড ঝনঝন শব্দে তিনজনই চমকে ওঠেন। আর কিছু নয়, শেলফের উপর থেকে টেবিল ল্যাম্পটাকে ফেলে ভেঙে শেষ করেছে ডাম্বল।

এবারে আবার ছেনু বেণু দুই বোনের অপ্রতিভ হওয়ার পালা, কিন্তু বুকুর মা 'হ্যাঁ- হ্যাঁ' করে ওঠেন— 'আহা আহা, যাক বেণুমাসি, ছেলেকে আর বকতে হবে না। ছোটো ছেলে দুরন্ত হবে না একটু? মাটির পুতুলের মতোন চুপ করে থাকবে? ছটফটে ছেলেই আমার ভালো লাগে।'

কাচ কুড়োতে বুকুর মা আরও বলেন, 'যে ছেলেরা ছোটোবেলায় দুরন্ত থাকে, তারাই নাকি বড়ো হয়ে মহাপুরুষ হয়'।

তারপর গল্প চলে। যত সব মেয়েলি গল্প আর কী। কবে মেয়ের বিয়ে হলো, কাদের বউয়ের কী কী গয়না হলো, শাড়ির আজকাল কীরকম জলের দর হয়ে গেছে— ছেনুমাসিরা তো আলমারি বোঝাই করে ফেলেছেন শাড়ি কিনে কিনে, বুকুর মা রাখছেন না কেন এই বেলা— এইসব আলোচনা।

গল্প থামাতে হয়, বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা দুজনে মিলে অতিথিদের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আসেন। বড়ো বড়ো রাজভোগ, ভালো ভালো সন্দেশ, শিঙাড়া, নিমকি—

ছেনুমাসিরা 'খাব না, খাব না' করেন; অবিশ্যি যেন ভয়ানক একটা কষ্টকর কাজ করছেন এইভাবে খেয়ে ফেলেনও সবই। ডাম্বল গাঁউ গাঁউ করে সব কিছু খেয়ে ফেলে, রেকাবির রস চাটে বসে বসে।

বুকর মা বলেন, 'এই বুকু, তোর বাবা এসেছেন আপিস থেকে? বল গে যা, মাসিমারা এসেছেন।'

'তা বাবা খুব জানেন! সেইজন্যেই তো চটেমটে লাল হয়ে বসে আছেন। বললেন — খুব যা হোক, ছেনুমাসিরা বেড়াতে আসার আর দিন পেলেন না! আমাদের সিনেমার টিকিটগুলো পচাবার জন্যে বেছে বেছে আজই আসতে ইচ্ছে হলো!'

হায়-হায়! কী করবেন বুকুর মা! ছেলেকে চড় কষাবেন , নিজেরই গালে -মুখে চড়াবেন? এ আবার কী ভীষণ শত্রুতা শুরু করেছে আজ বুকু। আর কী বলে মুখরক্ষা করবেন নিজের?

শুধু মনে মনে ভাবতে থাকেন, এরা একবার উঠলে হয়। ছেলের হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করে ছাড়বেন।

শুধু হাত দিয়ে পেরে উঠবেন, না লাঠিসোঁটা ধরবেন? ছেনুমাসিরা বিশ্বম্ভর মূর্তিতে বলেন, 'আচ্ছা তাহলে উঠি নির্মলা, তোমার অনেক ক্ষতি করে গেলাম—'

বুকুর মা কোন মুখে এ আর বলবেন— আবার একদিন এসো ছেনুমাসি! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বোকার মতো। ডাম্বল জুতোর মধ্যে পা গলাতে গলাতে বুকুকে বলে, 'আমায় তো খুব বলা হচ্ছিল, তুই ইস্কুলে ভরতি হয়েছিস?'

বুকু বুক টান করে বলে, 'নিশ্চয়!'

'কোন স্কুল?'

'আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।'

'ক-খানা বই রে?'

'সে অনেক। সবমিলিয়ে সাত-আটটা। ... বাবাঃ আর কত দেরি করবে তোমরা? যাও এবার! রাত্তির

হয়ে গেল যে! এখন মা কখনই-বা রান্না করবেন, আর কখনই-বা তোমাদের নিন্দে করবেন?'

'নিন্দে ... !'

ছেনুমাসিরা শুধু হার্টফেল করতে বাকি রাখেন।

আর বুকুর মা?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, হার্টফেল করেইছেন বুঝি-বা!

এবারে ডাম্বল ঘুসি পাকিয়ে আসে— 'নিন্দে কেন রে! নিন্দে কীসের?'

'বাঃ নিন্দে করা হবে না?' বুকু যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, এইভাবে বলে 'বেড়াতে-আসা লোক চলে গেলে, নিন্দে করতে হয় না তাদের ? বলতে হবে না— ছেলেটা কী অসভ্য হ্যাংলা— মাসিরা কী অহংকারী— এসে তো মাথা কিনলেন, শুধু শুধু একগাদা পয়সা খরচ হয়ে গেল? তাছাড়া—'

বুকু এত তাড়াতাড়ি কথা বলবে, ধরলে কথা থামায় কে? যা বলবার সবই বলে নেয় সে। তবু ওর 'তা ছাড়া—' কে থামিয়ে দিয়ে ছেনুমাসি বলেন, 'বলো বাবা, প্রাণ ভরে বলো'— বলে গটগট করে চলে যান। পিছন পিছন বেণুমাসি আর ডাম্বল।

আর ওঁরা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকুর মা রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে শুরু করেন ছেলে ঠ্যাঙাতে। ঠ্যাঙান আর চেঁচান— 'বল শয়তান ছেলে, কেন ওরকম কথা বললি? বল, বল শিগগির। মেরে মেরে তোকে মেরেই ফেলব আজ। তবু চুপ করে আছিস? কেন ওসব বললি? যতক্ষণ না বলবি, মার থামাব না আমি। লক্ষ্মীছাড়া পাজি বাঁদর। লোকের সামনে আমার মুখে চুনকালি!'

গোলমাল শুনে বুকুর বাবা এসে হাজির— 'কী হলো কী? ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছ কেন?'

'পিটব না'! বুকুর মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'পিটিয়ে ওকে তক্তা করব আমি। জানো— ও কী করেছে আজ?'

একে একে ছেলের ভূতুড়ে বুদ্ধির কথা বলতে থাকেন মা আর শুনতে শুনতে বাবা রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। তখন তিনিও লেগে যান প্রহারে।

সত্যি, যে ছেলে মা-বাপকে এভাবে বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ করে, তাকে মেরে তক্তা করে ফেললেই কি রাগ মেটে?

দুজনে মিলে চেঁচান, 'বল, বল কেন ওসব বললি?' বুকু অনেকক্ষণ গোঁ ধরে চুপ করে মার খাচ্ছিল; আর পারে না। ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, 'নিজেই তো দুপুরবেলা একশোবার করে বললে— সবসময়ে সত্যি কথা বলবি, কারো কাছে কিছু লকোবি না; এখন আবার নিজেই মারছ? কী করে বুঝব, আসলে কী করতে হবে?'

হাতেকলমে

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫) : অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা, অগ্নিপরীক্ষা, সাগর শুকায়ে যায়, শশীবাবুর সংসার, সোনার হরিণ* ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার,* একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্ এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

১.১ আশাপূর্ণা দেবীর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

১.২ আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য কোন কোন বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন?

২. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ বুকু কোথায় বসে খেলা করছিল?

২.২ রিকশা থেকে কারা নামলেন?

২.৩ ডাম্বল আলমারি ভেঙে কার বই নামিয়েছিল?

২.৪ বুকুর মা-র কী কেনা ছিল?

২.৫ বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা অতিথিদের জন্যে কী কী খাবার নিয়ে আসে?

২.৬ বুকু কোন স্কুলে ভরতি হয়েছিল?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় কেন?

৩.২ 'সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারব না বাবা' - কারা একথা বলেছেন? তাঁরা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারবেন না কেন?

৩.৩ 'ও কী! কী কাণ্ড করেছ তুমি' — কে, কী কাণ্ড করেছে?

৩.৪ বুকু অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?

৩.৫ ‘ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত’ — ছেলের কথা শুনে বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত হলো কেন?

৩.৬ ডাম্বলকে ইস্কুলে ভরতি করা হয়নি কেন?

৩.৭ ‘কে জানে পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে নাকি’ — কার সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে? এমন সন্দেহের কারণ কী?

৩.৮ ‘দুজনে মিলে চেঁচান, ‘বল, বল কেন ওসব বললি?’ — বুকু কেন ওসব বলেছিল?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

৪.১ গল্পে বুকুর আচরণ তাঁর মাকে অতিথিদের সামনে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। বুকুর এই আচরণ কি তুমি সমর্থন করো? বুকু কেন অমন আচরণ অতিথিদের সামনে করেছিল?

৪.২ বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৪.৩ ‘কী করে বুঝব, আসলে কী করতে হবে’ — গল্পে বুকু এই কথা বলেছিল। — আসলে কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?

৪.৪ গল্পে দুটি ছোটো ছেলের কথা পড়লে — বুকু আর ডাম্বল। দুজনের প্রকৃতিগত মিল বা অমিল নিজের ভাষায় লেখো।

৪.৫ গল্পটি পড়ে বুকুর প্রতি তোমার সমানুভূতির কথা ব্যক্ত করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

শব্দার্থ : বেজায় — অতিরিক্ত, খুব। বার দু-ত্তিন — দুই-তিন বাব। ইত্যবসরে –এই সুযোগে। মোলায়েম — কোমল ও মসৃণ। ড্যাবড্যাব করে — চোখ বড়ো বড়ো করে। গমগম — গম্ভীর শব্দ অভ্যর্থনা — সাদর আপ্যায়ন। ফ্যালফেলিয়ে — অবাক হয়ে, হতবুদ্ধি হয়ে। মাথায় বজ্রাঘাত — আকস্মিক বিপদে পড়া। হাটে হাঁড়ি ভাঙা — সবার মাঝে গোপন কথা প্রকাশ। ফাঁস — প্রকাশ (এখানে) ব্যাকুল — অস্থির। গাদাগাদি — ঠাসাঠাসি, ঘেঁষাঘেঁষি। বিচ্ছু — অতি দুরন্ত। বেয়াড়া — বিশ্রী, বদ। আহামরি --- প্রশংসাসূচক বা বিদ্রূপসূচক ধ্বনি। প্রসন্ন — আনন্দিত। হাড়কেপ্পন — অতি কৃপণ, খুব কিপটে। যথেষ্ট — ইচ্ছামতো। ধাতস্থ — প্রকৃতিস্থ, শান্ত। আক্কেল গুড়ুম — হতভম্ব অবস্থা। খণ্ডায় — নিবারণ করে। অপ্রতিভ — অপ্রস্তুত, হতবুদ্ধি। চটেমটে লাল — অত্যন্ত রেগে। বিশ্বম্ভর মূর্তি — আভিধানিক অর্থে বিশ্বকে যিনি ধারণ করেন, পাঠ্যাংশে ভয়ানক রূপ অর্থে। বেধড়ক — অপরিমিত, প্রচুর। প্রহার --- মার। অপদস্থ --- অপমানিত, লাঞ্ছিত।

৫. একই অর্থযুক্ত শব্দ গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

সংবাদ, পুস্তক, সন্তুষ্ট, কোমল, আপ্যায়ন।

৬. **নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

ইত্যবসরে, বজ্রাঘাত, ব্যাকুল, নিশ্চয়, রান্না, দুরন্ত, সন্দেশ।

৭. **নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ খুঁজে নিয়ে লেখো। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :**

মন, শিক্ষা, অবস্থা, গম্ভীর, শাসন, শয়তান, লাল, সর্বনেশে, ঘর, সুন্দর, দুরন্ত, মুখ, কথা, হ্যাংলা।

৮. **নীচের প্রতিটি উপসর্গ দিয়ে পাঁচটি করে নতুন শব্দ তৈরি করে লেখো:**

অ, বি, বে, আ, প্র, অব

৯. **সমোচ্চারিত/ প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে আলাদা আলাদা বাক্য রচনা করো:**

আসা	সোনা	হাড়
আশা	শোনা	হার
মার	মাস	জ্বালা
মাড়	মাষ	জালা

১০. **এই গল্পে অজস্র শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলি গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো:**

(দুটি শব্দ খুঁজে দেওয়া হলো)

খুকখুক, তোড়জোড়।

১১. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক/পূরণবাচক শব্দ খুঁজে বার করো:**

১১.১ মা তো সেই তিনতলার ছাতে।

১১.২ দুই বোনের দুই দু-গুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে।

১১.৩ সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা।

১১.৪ নিজেই তো দুপুরবেলা একশো বার করে বললে — সবসময় সত্যি কথা বলবি।

১২. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

১২.১ বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়। (জটিল বাক্যে)

১২.২ ছেনুমাসি আর অন্যটির নাম বেণুমাসি। (সরল বাক্যে)

১২.৩ যত বড়ো হচ্ছে তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে। (যৌগিক বাক্যে)

১২.৪ ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত। (জটিল বাক্যে)

১৩. পাকা, মাথা — এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো।

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি

জীবনানন্দ দাশ

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি— রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের— কোন গল্প, কী কাহিনি, কী স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে, আহা, কেউ তাহা জানেনাকো—কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ঐ প্রান্তরের শঙ্খচিল; তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়— যেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে
এ হৃদয়— স্বপ্নে যে-বেদনা আছে : শুষ্ক পাতা— শালিকের স্বর,
ভাঙা মঠ— নক্‌শাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো সরে যায়, জলসিড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দহীন বুনো চালতার:
জলে তার মুখখানা দেখা যায়— ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর,
ঝাঁঝরা-ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে:
পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি— রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁদে-কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

হাতে কলমে

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪): রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - *ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা* প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — *মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি* প্রভৃতি পাঠ্য কবিতাটি তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১.১ জীবনানন্দ দাশের লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ 'দু-পহর' শব্দের অর্থ কী?

২.২ 'কেবল প্রান্তর জানে তাহা' — 'প্রান্তর' কী জানে?

২.৩ 'তাহাদের কাছে যেন এ জনমে নয় — যেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে এ হৃদয়' — কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.৪ 'জলসিড়িটির পাশে ঘাসে ...' — কী দেখা যায়?

২.৫ 'জলে তার মুখখানা দেখা যায়...' — জলে কার মুখ দেখা যায়?

২.৬ 'ডিঙিও ভাসিছে কার জলে...' — ডিঙিটি কেমন?

২.৭ ডিঙিটি কোথায় বাঁধা রয়েছে?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ পাড়াগাঁয়ের দ্বিপ্রহরকে কবি ভালোবাসেন কেন?

৩.২ 'স্বপ্নে যে-বেদনা আছে' — কবির স্বপ্নে কেন বেদনার অনুভূতি?

৩.৩ প্রকৃতির কেমন ছবি কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৩.৪ 'কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে' — কবির এমন মনে হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি ... শীর্ষক কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কতসংখ্যক কবিতা? 'পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি' কবিতায় কবি জীবনানন্দের কবি-মানসিকতার পরিচয় কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও।

৪.২ কবিতাটির গঠন-প্রকৌশল আলোচনা করো।

৪.৩ 'গন্ধ লেগে আছে রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার' — কবিতায় কীভাবে এই অপরূপ বিষণ্ণতার স্পর্শ এসে লেগেছে, তা যথাযথ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।

শব্দার্থ: দু-পহর --- দ্বিপ্রহর। ঝাঁঝরা-ফোঁপরা — জীর্ণ,ফাঁপা বা শূন্য। জলসিড়ি--- বাংলাদেশের একটি নদী।

৫. **নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো:**

পাড়াগাঁ, দু-পহর, স্বপন, জনম, ভিজে।

৬. **নীচের শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :**

শঙ্খচিল, নক্‌শাপেড়ে, ছন্দহীন

৭. **নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :**

৭.১ পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি—

৭.২ রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে স্বপনের—

৭.৩ শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দহীন বুনো চালতার :

৭.৪ ডিঙিও ভাসিছে কার জলে, ...

৭.৫ কোনোদিন এইদিকে আসিবে না আর, ...

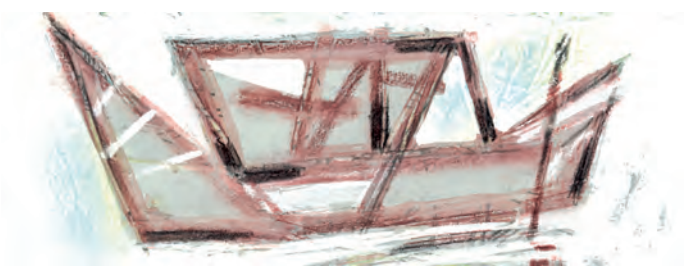

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে

বিজয় সরকার

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে এল, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ।
আমার এমনি দিনে মনের কূলে লেগেছে ভাঙন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

চূর্ণি নদীর ঘূর্ণিপাকে যেথা পড়ল চর
সেই চরেতে বেঁধেছিলাম বসতি এক ঘর
আমার সে ঘর ভেসে গেল দিন কয়েক পর এসে এক প্লাবন, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ॥

ছায়াভিটে হিজলগাছে জলপরি কন্যা
উদাস চোখে চেয়ে দেখে শ্রাবণের বন্যা
আমি কাঁদি তাহার কান্না তার কি নাই কাঁদন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

মেঠো আগুন নেভে রে জলের ছিটে লেগে
রাবণের চিতা নেভে না বন্ধু, শ্রাবণের মেঘে
ওসে আগুন জ্বলে দ্বিগুণ বেগে দুঃসহ দাহন, এল রে
এল আমার দুরন্ত শ্রাবণ॥

শ্রাবণ আবার আসিল ফিরে একটি বছর পর
ফিরে আসার আশা নাই রে বানে ভাসা ঘর
পাগল বিজয় বলে এমনই তোর বিধাতার বাধন, এল রে
এল আমার ঘরভাঙা শ্রাবণ॥

বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) : বিখ্যাত কবিয়াল, গীতিকার, সুরকার এবং বাউল-ফকিরি গানের গায়ক। দুই বাংলায় তাঁর গানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম। বর্তমান গানটি বাংলাদেশ লালন একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বকণ্ঠে বিজয়' অ্যালবাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

নাটোরের কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প — সেই প্রথম স্বদেশি যুগের সময়কার, কী করে আমরা বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম।

ভূমিকম্পের বছর সেটা। প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স হবে নাটোরে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন রিসেপসন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমরা তাঁকে শুধু 'নাটোর' বলেই সম্ভাষণ করতুম। নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমাদের কাউকে ছাড়বেন না — দীপুদা, আমরা বাড়ির অন্য সব ছেলেরা সবাই তৈরি হলুম, রবিকাকা তো ছিলেনই। আরো অনেক নেতারা, ন্যাশনাল কংগ্রেসের চাঁইরাও গিয়েছিলেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল, ডব্লিউ. সি. বোনার্জি, মেজোজ্যাঠামশায়, লালমোহন ঘোষ — প্রকাণ্ড বক্তা তিনি, বড়ো ভালো লোক ছিলেন, আর কী সুন্দর বলতে পারতেন। কিন্তু ঝোঁক ওই ইংরেজিতে — সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, আরো অনেকে ছিলেন — সবার নাম কি মনে আসছে এখন।

তৈরি তো হলুম সবাই যাবার জন্য। ভাবছি যাওয়া-আসা হাঙ্গাম বড়ো। নাটোর বললেন, কিছু ভাবতে হবে না দাদা।

ব্যবস্থা হয়ে গেল, এখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে আমাদের জন্য। রওনা হলুম সবাই মিলে হৈ-হৈ করতে করতে। চোগাচাপকান পরেই তৈরি হলুম, তখনো বাইরে ধুতি পরে চলাফেরা অভ্যেস হয়নি। ধুতি-পাঞ্জাবি সঙ্গে নিয়েছি, নাটোরে পৌঁছেই এ-সব খুলে ধুতি পরব।

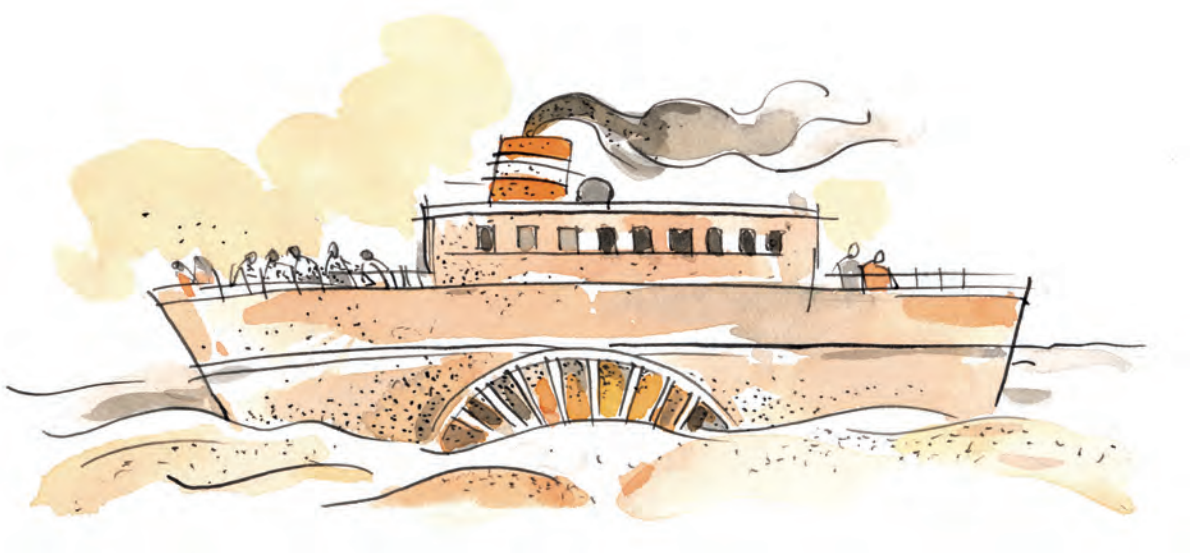

আমরা যুবকরা ছিলুম একদল, মহাফুর্তিতে ট্রেনে চড়েছি। নাটোরের ব্যবস্থা — রাস্তায় খাওয়াদাওয়ার কী আয়োজন। কিছুটি ভাবতে হচ্ছে না, স্টেশনে স্টেশনে খোঁজখবর নেওয়া, তদারক করা, কিছুই বাদ যাচ্ছে না — মহা আরামে যাচ্ছি। সারাঘাট তো পৌঁছানো গেল। সেখানেও নাটোরের চমৎকার ব্যবস্থা। কিছু ভাববারও নেই, কিছু করবারও নেই, সোজা স্টিমারে উঠে যাওয়া।

সঙ্গের মোটঘাট, বিছানা-কম্বল?

নাটোর বললেন, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে।

আমি বললুম, আরে, ভাবব না তো কী। ওতে যে ধুতি-পাঞ্জাবি সবকিছুই আছে।

নাটোর বললেন, আমাদের লোকজন আছে, তারা সব ব্যবস্থা করবে।

দেখি নাটোরের লোকজনেরা বিছানাবাক্স মোটঘাট সব তুলছে, আর আমার কথা শুনে মিটিমিটি হাসছে। যাক, কিছুই যখন করবার নেই, সোজা ঝাড়া হাত-পায় স্টিমারে নির্ভাবনায় উঠে গেলুম। পদ্মা দেখে মহা খুশি আমরা, ফুর্তি আর ধরে না। খাবার সময় হলো, ডেকের উপর টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে খাবার জায়গা করা হলো। খেতে বসেছি সবাই একটা লম্বা টেবিলে। টেবিলের একদিকে হোমরাচোমরা চাঁইরা, আর একদিকে আমরা ছোকরারা, দীপুদা আমার পাশে। খাওয়া শুরু হলো, 'বয়'রা খাবার নিয়ে আগে যাচ্ছে ওইপাশে,

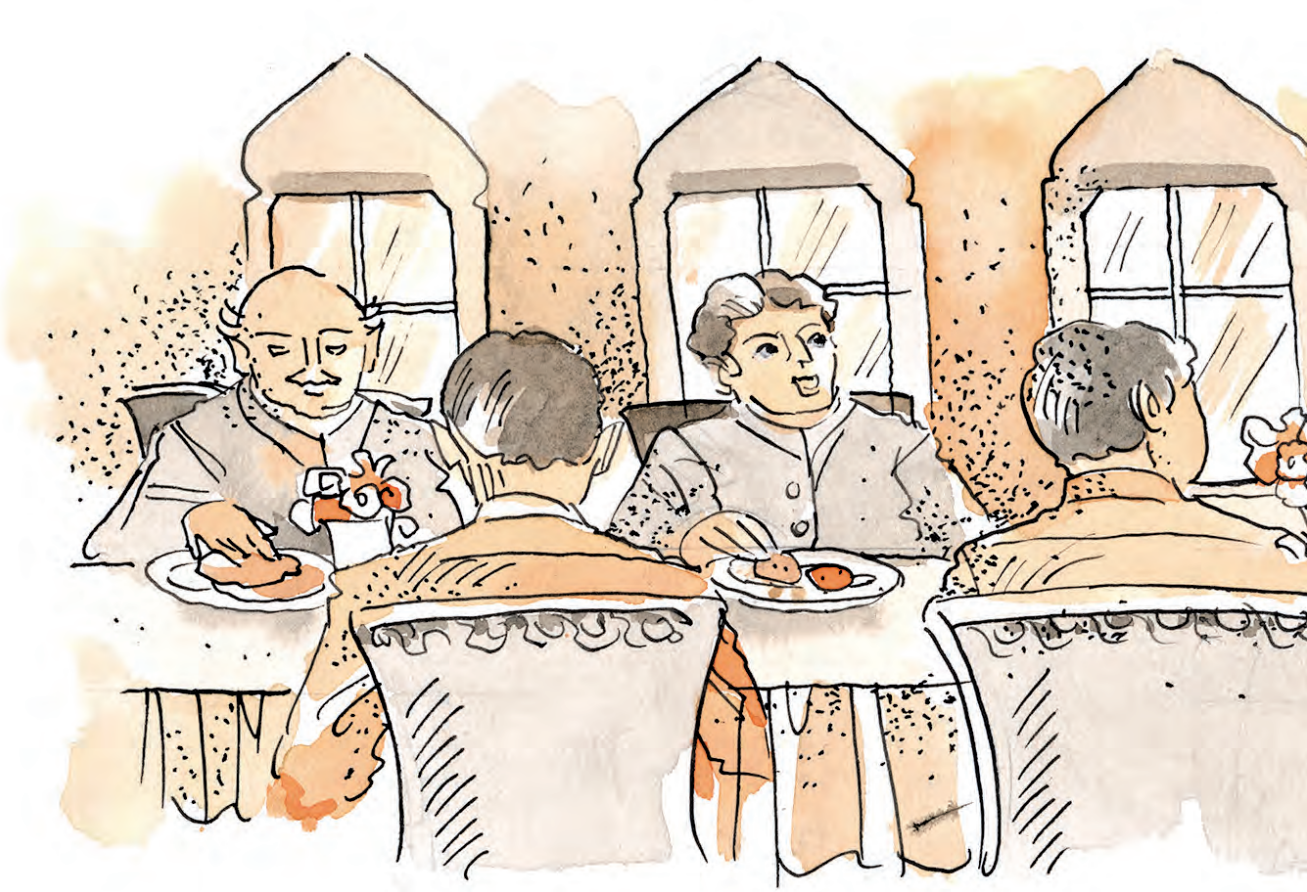

চাঁইদের দিকে, ওদের দিয়ে তবে তো আমাদের দিকে ঘুরে আসবে। মাঝখানে বসেছিলেন একটি চাঁই ; তাঁর কাছে এলে খাবারের ডিশ প্রায় শেষ হয়ে যায়। কাটলেট এল তো সেই চাঁই ছ-সাতখানা একবারেই তুলে নিলেন। আমাদের দিকে যখন আসে তখন আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না; কিছু বলতেও পারিনে। পুডিং এল; দীপুদা বললেন, অবন, পুডিং এসেছে, খাওয়া যাবে বেশ করে। দীপুদা ছিলেন খাইয়ে, আমিও ছিলুম খাইয়ে। পুডিং-হাতে বয় টেবিলের একপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে যেই সেই চাঁইয়ের কাছে এসেছে, দেখি তিনি অর্ধেকের বেশি নিজের প্লেটে তুলে নিলেন। ওমা, দীপুদা আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। দীপুদা বললেন, হলো আমাদের আর পুডিং খাওয়া!

সত্যি বাপু, অমন 'জাইগ্যানটিক' খাওয়া আমরা কেউ কখনও দেখিনি। ওইরকম খেয়ে খেয়েই শরীরখানা ঠিক রেখেছিলেন ভদ্রলোক। বেশ শরীরটা ছিল তাঁর বলতেই হবে। দীপুদা শেষটায় বয়কে টিপে দিলেন, খাবারটা আগে যেন আমাদের দিকেই আনে। তারপর থেকে দেখতুম, দুটো করে ডিশে খাবার আসত। একটা বয় ওদিকে খাবার দিতে থাকত আর-একটা এদিকে। চোখে দেখে না খেতে পাওয়ার জন্য আর আপশোশ করতে হয়নি আমাদের।

নাটোর তো পৌঁছানো গেল। এলাহি ব্যাপার সব। কী সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি, বৈঠকখানা। ঝাড়লণ্ঠন, তাকিয়া, ভালো ভালো দামি ফুলদানি, কার্পেট, সে সবের তুলনা নেই — যেন ইন্দ্রপুরী। কী আন্তরিক, আদরযত্ন,

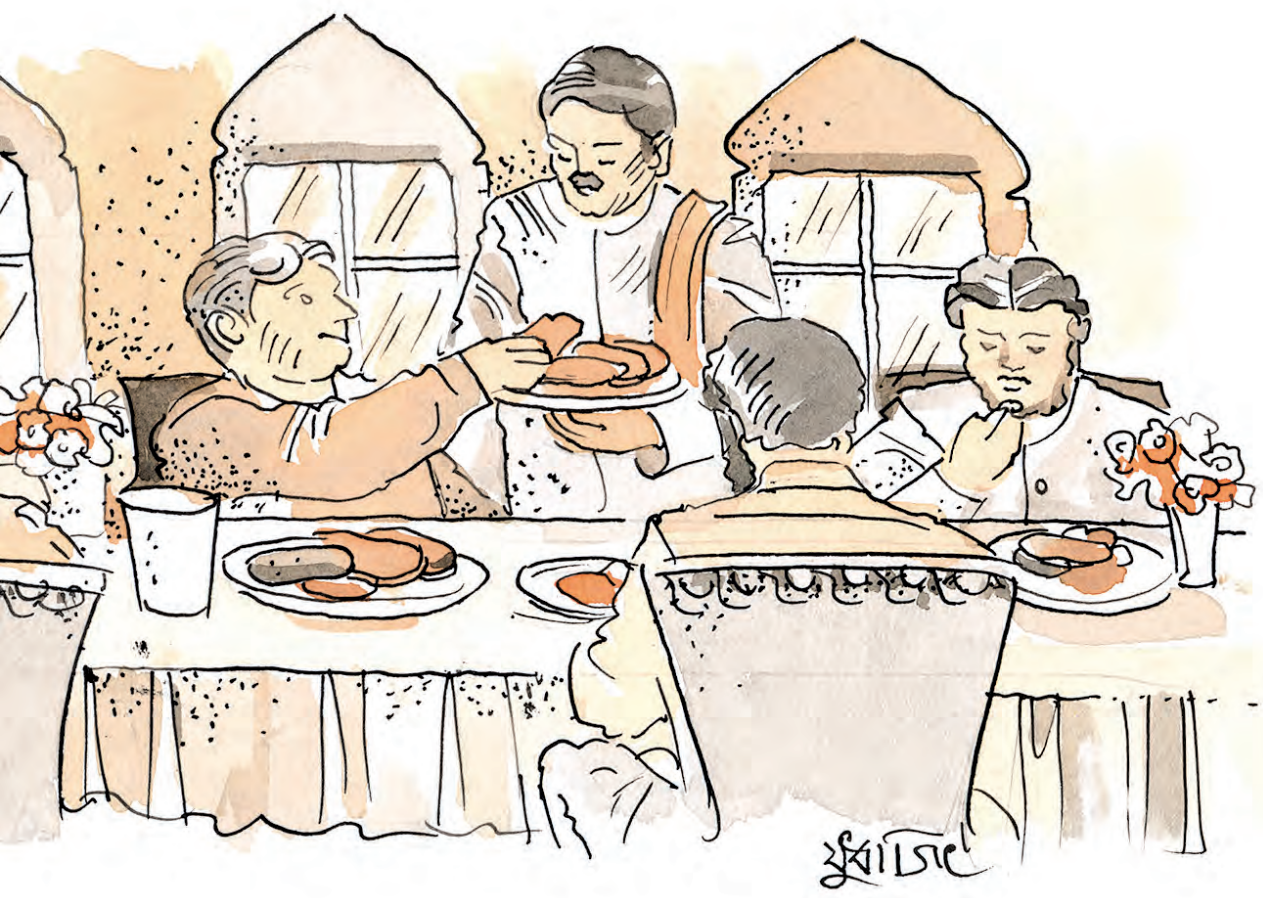

কী সমারোহ, কী তার সব ব্যবস্থা। একেই বলে রাজসমাদর। সবকিছু তৈরি হাতের কাছে। চাকর-বাকরকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, না চাইতেই সব জিনিস কাছে এনে দেয়। ধুতি-চাদরও দেখি আমাদের জন্য পাট-করা সব তৈরি, বাক্স আর খুলতেই হলো না। তখন বুঝলুম, মোটঘাটের জন্য আমাদের ব্যগ্রতা দেখে ওখানকার লোকগুলি কেন হেসেছিল।

নাটোর বললেন, কোথায় স্নান করবে অবনদা, পুকুরে?

আমি বললুম, না দাদা, সাঁতার-টাতার জানিনে, শেষটায় ডুবে মরব। তার উপর যে ঠান্ডা জল আমি ঘরেই চান করব। চানটান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেশ ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। আমরা ছোকরার দল, আমাদের তেমন কোনো কাজকর্ম ছিল না। রবিকাকাদের কথা আলাদা। খাওয়া-দাওয়া, ধুমধাম, গল্পগুজব— রবিকাকা ছিলেন — গানবাজনাও জমত খুব। নাটোরও ছিলেন গানবাজনার বিশেষ উৎসাহী। তিনিই ছিলেন রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্ট। কাজেই তিনি সব ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে খবরাখবর করতেন; মজার কিছু ঘটনা থাকলে আমাদের ক্যাম্পে এসে খবরটাও দিয়ে যেতেন। খুব জমেছিল আমাদের। রাজসুখে আছি। ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে, তখনো চোখ খুলিনি, চাকর এসে হাতে গড়গড়ার নল গুজে দিলে। কে কখন তামাক খায়, কে দুপুরে এক বোতল সোডা, কে বিকেলে একটু ডাবের জল, সবকিছু নিখুঁতভাবে জেনে নিয়েছিল, —কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবার জো নেই। খাওয়া-দাওয়ার তো কথাই নেই। ভিতর থেকে রাণিমা নিজের হাতে পিঠে-পায়েস করে পাঠাচ্ছেন। তার উপরে নাটোরের ব্যবস্থায় মাছ-মাংস-ডিম কিছুই বাদ যায়নি, হালুইকর বসে গেছে বাড়িতেই, নানা-রকমের মিষ্টি করে দিচ্ছে এবেলা-ওবেলা।

আমি ঘুরে ঘুরে নাটোরের গ্রাম দেখতে লাগলুম — কোথায় কী পুরোনো বাড়ি-ঘর-মন্দির। সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ করে যাচ্ছি। অনেক স্কেচ করেছি সেবারে, এখনো সেগুলি আমার কাছে আছে। চাঁইদেরও অনেক স্কেচ করেছি ; এখন সেগুলি দেখতে বেশ মজা লাগবে। নাটোরেরও খুব আগ্রহ, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন একেবারে অন্দরমহলে রানি ভবানীর ঘরে। সেখানে বেশ সুন্দর সুন্দর ইটের উপর নানা কাজ করা। ওঁর রাজত্বে যেখানে যা দেখবার জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আর আমি স্কেচ করে নিচ্ছি, নাটোর তো খুব খুশি। প্রায়ই এটা ওটা স্কেচ করে দেবার জন্য ফরমাশও করতে লাগলেন। তাছাড়া আরো কতরকমের খেয়াল — শুধু আমি নয়, দলের যে যা খেয়াল করছে, নাটোর তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করছেন। ফুর্তির চোটে আমার সব অদ্ভুত খেয়াল মাথায় আসত। একদিন খেতে খেতে বললুম, কী সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন নাটোর, টেবিলে আনতে আনতে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম সন্দেশ খাওয়ান দেখি। বেশ গরম গরম চায়ের সঙ্গে গরম গরম সন্দেশ খাওয়া যাবে। শুনে টেবিলসুদ্ধ সবার হো-হো করে হাসি। তক্ষুণি হুকুম হলো, খাবার ঘরের দরজার সামনেই হালুইকর বসে গেল। গরম গরম সন্দেশ তৈরি করে দেবে ঠিক খাবার সময়ে।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বসল। গোল হয়ে সবাই বসেছি। মেজোজ্যাঠামশায় প্রিসাইড করবেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন; তাঁর পাশে বসেছিলেন নাটোরের ছোটো তরফের রাজা, মাথায় জরির তাজ, ঢাকাই মসলিনের চাপকান পরে। ন-পিসেমশাই কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁর সেই সাজ কালো বুটিদার করে দিলেন।

আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে; আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান

হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষপর্যন্ত লড়ব এজন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব-কিছু ইংরেজিতে। অনেক তক্কাতক্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যান্ডেলে। বসেছি সব, কনফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হলো। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধহয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল—রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন, প্রেসিডেন্ট উঠেছেন স্পিচ দিতে ; ইংরেজিতে যেই-না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম — বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি — বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজিদুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেন্টারি বক্তা — তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন। যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে, তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কনফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হলো। সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।

যাক, আমাদের তো জিত হলো; এবারে প্যান্ডেলের বাইরে এসে একটু চা খাওয়া যাক। বাড়িতে গিয়েই চা খাবার কথা, তবে ওখানেও চায়ের ব্যবস্থা কিছু ছিল। নাটোর বললেন, কিন্তু গরম গরম সন্দেশ আজ চায়ের সঙ্গে খাবার কথা আছে যে অবনদা। আমি বললুম, সে তো হবেই, এটা হলো উপরি-পাওনা, এখানে, একটু চা খেয়ে নিই তো আগে। এখনকার মতো তখন আমাদের খাও খাও বলতে হতো না। হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে দিতেম।

হাতে কলমে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুর ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* অলঙ্করণ করেন। বিলাতি শিল্পীদের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। মুঘল ও প্রাচীন ভারতের মহিমা এবং ভারতীয় জীবনচিত্র ছিল তাঁর ছবির অন্যতম বিষয়। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি বাঙালির অক্ষয় সম্পদ। বাংলাদেশের আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, রূপকথা তাঁর লেখায় নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। *রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ, নালক, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, খাতাঞ্চির খাতা, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ভারতশিল্প, বাংলার ব্রত, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ* তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। পাঠ্যাংশটি তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ ‘আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প’ — লেখকের অনুসরণে সেই ‘গল্প’টি নিজের ভাষায় বিবৃত করো।

২.২ লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী, তখনকার নাটোরের মহারাজার নাম কী ছিল?

২.৩ তিনি কোন ‘রিসেপশন কমিটি’র প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

২.৪ ‘নাটোর নেমন্তন্ন করলেন... ’ — সেই নেমন্তন্নের তালিকায় কাদের নাম ছিল বলে লেখক স্মরণ করতে পেরেছেন?

২.৫ ‘রওনা হলুম সবাই মিলে হৈ হৈ করতে করতে।’
— কোথায় রওনা হলেন? কীভাবেই বা রওনা হলেন?

২.৬ সরাঘাট থেকে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা কোন নদীতে স্টিমার চড়েছিলেন?

২.৭ স্টিমারে খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচনায় লেখকের সরস মনের পরিচয় কীভাবে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তা বুঝিয়ে দাও।

২.৮ ‘যেন ইন্দ্রপুরী।’ — কীসের সঙ্গে ‘ইন্দ্রপুরী’র তুলনা করা হয়েছে? কেনই বা লেখক এমন তুলনা করেছেন?

২.৯ ‘একেই বলে রাজ সমাদর।’ — উদ্ধৃতিটির আলোকে নাটোরের মহারাজার অতিথি-বাৎসল্যের পরিচয় দাও।

২.১০ ‘নাটোরের খুব আগ্রহ’ — কোন প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.১১ ‘আগে থেকেই ঠিক ছিল’ — আগে থেকে কী ঠিক থাকার কথা বলা হয়েছে? সেই উপলক্ষ্যে কোন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা পাঠ্যাংশে রয়েছে, তা আলোচনা করো।

২.১২ নাটোরে প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গানটি পরিবেশন করেছিলেন?

২.১৩ ‘আমাদের তো জয়জয়কার।’ — কী কারণে লেখক ও তাঁর সঙ্গীদের ‘জয়জয়কার’ হলো?

২.১৪ ‘সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।’ — লেখকের অনুসরণে সেই ‘লড়াই’-এর বিশদ বিবরণ দাও।

৩. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

৩.১ আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প — সেই প্রথম স্বদেশি যুগের সময়কার, কী করে আমার বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম। (জটিল বাক্যে)

৩.২ ভূমিকম্পের বছর সেটা। প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স হবে নাটোরে। (বাক্যদুটিকে জুড়ে লেখো)

৩.৩ নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। (যৌগিক বাক্যে)

৩.৪ আরো অনেকে ছিলেন — সবার নাম কি মনে আসছে এখন। (না-সূচক বাক্যে)

৩.৫ নাটোর বললেন, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে। (পরোক্ষ উক্তিতে)

৩.৬ অমন ‘জাইগ্যানটিক’ খাওয়া আমরা কেউ কখনো দেখিনি। (নিম্নরেখ শব্দটির পরিবর্তে বাংলা শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি আবার লেখো।)

৩.৭ ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৩.৮ ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন। (বাক্যটিকে দু’টি বাক্যে ভেঙে লেখো)

৩.৯ গরম গরম সন্দেশ আজ চায়ের সঙ্গে খাবার কথা আছে যে অবনদা। (নিম্নরেখ শব্দের প্রকার নির্দেশ করো এবং অর্থ এক রেখে অন্য শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি আবার লেখো)

৩.১০ হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে দিতেম। (জটিল বাক্যে)

শব্দার্থ: চোগাচাপকান — লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। জাইগ্যানটিক — দৈত্যাকৃতি। হোমরাচোমরা —সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তিযুক্ত। চাঁই —প্রধান, নেতা। স্পিচ — বক্তৃতা। প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স — প্রাদেশিক সম্মেলন।

৪. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধ শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

৪.১ স্টিমারে নির্ভাবনায় উঠে গেলুম।

৪.২ তিনি অর্ধেকের বেশি নিজের প্লেটে তুলে নিলেন।

৫. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

হাঙ্গাম, আপসোস, চান, তক্কাতক্কি, জিজ্ঞেস

৬. নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করো :

স্বদেশি, জিজ্ঞাসা, ঢাকাই

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

চোগাচাপকান, বিছানাবাক্স, ইন্দ্রপুরী, রাজসমাদর, গল্প-গুজব, অন্দরমহল

৯. কোনটি কী ধরনের সর্বনাম তা লেখো:

আমরা, সেটা, তাঁকে, সবাই, তিনি, আমি, এটা

মিলিয়ে পড়ো

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

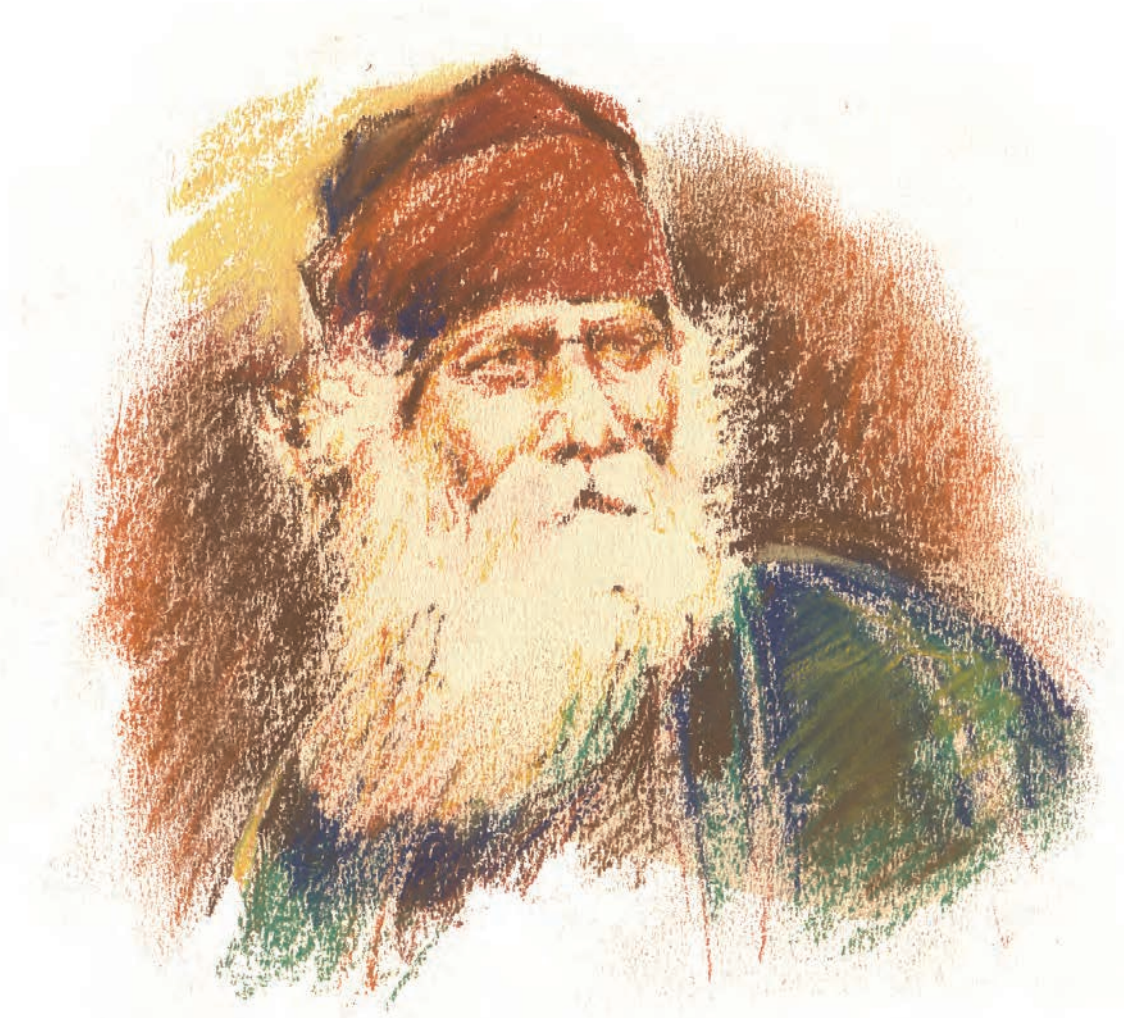

জ্যোতিদাদার* উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু** ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

** রাজনারায়ণ বসু

মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভার আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহা নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।

(অংশ)

গড়াই নদীর তীরে

জসীমউদ্দীন

গড়াই নদীর তীরে,
কুটিরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফুল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোটো ছোটো ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।
মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লংকা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লংকার রং, মসুরের রং মটরের রং আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!
যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে।

হা
তে
ক
ল
মে

জসীমউদ্দীন (১৯০৪—১৯৭৬) : পল্লিকবি হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। *নক্সীকাঁথার মাঠ*, *রাখালী*, *বালুচর*, *ধানক্ষেত*, *সোজনবাদিয়ার ঘাট* তাঁর অমর সৃষ্টি। *বেদের মেয়ে* শীর্ষক গীতিনাট্য, *চলে মুসাফির* নামক ভ্রমণ কাহিনি ও *ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়* গ্রন্থরচনায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার অনন্যতা ধরা পড়েছে। পাঠ্যাংশটি তাঁর *সোজনবাদিয়ার ঘাট* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি জসীমউদ্দীন কোন অভিধায় অভিহিত?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ কবিতায় বর্ণিত নদীটির নাম কী?

২.২ মাচানের 'পরে কী আছে?

২.৩ মানুষের বসত করার কথা এখানে কারা বোঝেনি?

২.৪ উঠানেতে কী কী শুকাচ্ছে?

২.৫ বাড়িটিকে ভালবেসে কারা বেড়াতে এলে কিছুক্ষণ থেমে রয়?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ 'কুটীরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে'— এখানে কুটিরটিকে লতাপাতা-ফুলের মায়া দিয়ে ঘিরে রাখা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩.২ ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে'— 'ডাহুক মেয়ে' কারা? তারা কাদের নিয়ে আসে? তারা কীভাবে কথা বলে?

৩.৩ 'যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান আখরে ভরি'— 'আখর' শব্দটির অর্থ কী? সুখের কাহিনির যে নানা ছবি কবি এঁকেছেন তার মধ্যে কোনটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং কেন?

৩.৪ 'কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে'— রঙিন মেঘেরা বাড়িটিকে ভালোবেসে থেমে থাকে। এর মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৪.১ 'এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি'— কবিতায় কবি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম যে গ্রামীণ কুটিরের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তার বিবরণ দাও।

৪.২ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কবিতায় কবি পরম মমতায় গ্রামীণ কুটিরের ছবি এঁকেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ির সঙ্গে এমন একটি মমতাময় সম্পর্ক আছে। তুমি তোমার বাড়ির বিভিন্ন অনুষঙ্গের বিবরণ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

শব্দার্থ: মাচান — বাঁশ ইত্যাদির তৈরি উঁচু বেদি বা মঞ্চ। এঁদো ডোবা — নোংরা ও পঙ্কিল জলাশয়। হেথায় — এখানে। আখরে —অক্ষরে, বর্ণে।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো :

৫.১ কুটিরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।

৫.২ উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।

৫.৩ লংকা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।

৫.৪ জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!

৫.৫ কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালোবেসে।

৬. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

৬.১ লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ। (জটিল বাক্যে)

৬.২ ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে। (চলিত গদ্যে)

৬.৩ গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে (না-সূচক বাক্যে)

৬.৪ এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে। (যৌগিক বাক্যে)

৭. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

কুমড়া, কালিজিরা, উঠান, সযতনে, আখর, সাঁঝ

৮. কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

৮.১ গড়াই নদীর তীরে

৮.২ উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি

৮.৩ গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে

৮.৪ যেন একখানি সুখের কাহিনি নানান আখরে ভরি

৮.৫ সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে

৯. নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণির বিশেষ্য তা নির্দেশ করো :

মানুষ — ফুলগুলি —

আনন্দ — আলপনা —

১০. নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণির সর্বনাম তা নির্দেশ করো :

যার — তাহারা —

কেউ — তার —

১১. এঁদো, লাল, বুনো, রঙিন — বিশেষণগুলির সাহায্যে নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করো।

জেলখানার চিঠি

সুভাষচন্দ্র বসু

মান্দালয় জেল
২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে, এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে 'double distillation'-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু এবার তা হয়নি। সেজন্য খুবই খুশি হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমল ভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার 'censor' -এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা ; কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত

আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেকখানিই কোনো এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। এ-কথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি— কেন না, সেটা নিছক ভন্ডামি হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোনো ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ-প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র। ... কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্স্-এর মতো উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বলো একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থাা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি— যেটা কারাশাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে — তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখে কষ্টেআর কোনো যন্ত্রণা থাকত না এবং তাহাতেই তো আত্মা ও দেহের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণত একটা দার্শনিক ভাব বন্দিদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার যতেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে; কিন্তু আমাদের কষ্টতো শুধু আধ্যাত্মিক নয় — সে যে শরীরের এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দি হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রাকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' বলে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্তত আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে Martyr বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। স্পর্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিসটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom'জিনিসটা আমার কাছে বড়োজোর একটা আদর্শই হতে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশি দিনের মেয়াদের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে আকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অকেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটার অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সংগীতের অভাব, যাহা সর্বশেষ উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি এভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকালবার্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সংগীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিকনিক, বিশ্রম্ভালাপ, সংগীতচর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমতো কাব্য সাহিত্যের চর্চা — এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দি করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সমাজিক বিধিব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মতো নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ-কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধু-বান্ধবের এবং সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকেই প্রভাবটা নিতান্ত

অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোনো সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের Yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে, সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়িতে কোনো সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে, সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতার লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির তো শেষ আছে। আমার বেশি উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেই বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্তত এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন — এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে, — এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দু আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটোখাটো অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে তো দুঃসংবাদ বা নিরুৎসাহের কোনো কারণ দেখি না; বরং আমার মনে হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে করো, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ-কথা বলা আনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি —

(ইংরাজি থেকে অনূদিত)

হাতেকলমে

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতি জনপ্রিয় নেতা। ভারত বিদ্বেষী ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। প্রথম জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। গৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৯৪১ সালে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে তিনি কাবুল হয়ে রাশিয়ায় পৌঁছান। পরে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে *আজাদ হিন্দ ফৌজ*-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *তরুণের স্বপ্ন*, *An Indian pilgrim* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১.১ সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কেন?

১.২ রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে তিনি কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন?

২. **অনধিক তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ তোমার পাঠ্য পত্রখানি কে, কোথা থেকে, কাকে লিখেছিলেন?

২.২ কোন ব্যাপারটিকে পত্রলেখক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেছেন?

২.৩ বন্দিদশায় মানুষের মনে শক্তি সঞ্চারিত হয় কীভাবে?

২.৪ মান্দালয় জেল কোথায় অবস্থিত?

২.৫ ভারতীয় জেল বিষয়ে একটি পুস্তক সুভাষচন্দ্রের লেখা হয়ে ওঠেনি কেন?

২.৬ সুভাষচন্দ্র কেন দিলীপ রায়র প্রেরিত বইগুলি ফেরত পাঠাতে পারেননি?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৩.১ নেতাজি ভবিষ্যতের কোন্ কর্তব্যের কথা এই চিঠিতে বলেছেন? কেন এই কর্তব্য স্থির করেছেন? কারা-শাসন প্রণালী বিষয়ে কাদের পরিবর্তে কাদের প্রণালীকে তিনি অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেছেন?

৩.২ 'সেজন্য খুবই খুশি হয়েছি।' — বক্তা কে? তিনি কীজন্য খুশি হয়েছেন?

৩.৩ 'আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন।' — কে, কাকে এ কথা বলেছেন? কীসের উত্তর দেবার কথা বলা হয়েছে?

৩.৪ 'পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী।'— উদ্ধৃতির সমার্থক বাক্য পত্রটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। সেই বাক্যটি থেকে লেখকের কোন মানসিকতার পরিচয় পাও?

৩.৫ 'আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।' — কোন প্রসঙ্গে বক্তার এই উক্তি? জেলজীবনে তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কীভাবে লাভবান হবার কথা বলেছেন?

৩.৬ 'Martyrdom' শব্দটির অর্থ কী? এই শব্দটি উল্লেখ করে বক্তা কী বক্তব্য রেখেছেন?

৩.৭ 'যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দি করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়?' — কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? 'তাদের মূল্য' বিষয়ে লেখকের বক্তব্য আলোচনা করো।

৩.৮. 'মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়।' — যে ঘটনায় লেখকের মনে এই উপলব্ধি ঘটে তার পরিচয় দাও।

৩.৯ এই চিঠিতে কারাবন্দি অবস্থাতেও দুঃখকাতর, হতাশাগ্রস্ত নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী নেতাজির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। — পত্রটি অবলম্বনে নিজের ভাষায় মন্তব্যটির যাথার্থ্য পরিস্ফুট করো।

৩.১০ কারাগারে বসে নেতাজির যে ভাবনা , যে অনুভব, তার অনেকখানি কেন অকথিত রাখতে হবে?

৪. নীচের বাক্যগুলির তথ্যগত অশুদ্ধি সংশোধন করো :

৪.১ নেতাজি মনে করতেন না যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।

৪.২ কারাগারে বন্দি অবস্থায় নেতাজি সুভাষ গীতার আলোচনা লিখেছিলেন।

৪.৩ জেল জীবনের কষ্ট মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বলে নেতাজি মনে করতেন।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাসবদ্ধ পদ বেছে নিয়ে ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো :

৫.১ তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে কোমলভাবে স্পর্শ করেছে।

৫.২ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি।

৫.৩ তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে।

৫.৪ নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

৫.৫ লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন।

শব্দার্থ:- আধ্যাত্মিক — অধ্যাত্ম বা আত্মা সম্বন্ধীয়, স্থৈর্য — স্থিরতা, আত্মম্ভরিতা — অহংকার, অবমাননা — অপমান /অনাদর, বাহ্য — বাহির, লীন — মিলিত/লুপ্ত।

৬. শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো :

পাঠক, দর্শন, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, ভণ্ডামি, সমৃদ্ধ, মহত্ত্ব, অভিজ্ঞতা।